স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৬ষ্ঠ বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৭

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ ❑ প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

ডাক্তারের ওপর আক্রমণ—অসন্তোষের কারণ।

ডাক্তারের পয়সা আর সাফল্য দেখে সকলের চোখ টাটাচ্ছে, এটা একমাত্র সত্য নয়। এখন ক্রেতা আর বাজারের প্রতিযোগিতাই শেষ কথা। যেহেতু ব্যক্তি চিকিৎসকের কেবল ব্যবসায়ী-মাত্র হয়ে উঠতে পারেন না, তাই আজ নানাভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে যাতে একাকী চিকিৎসক টিকে থাকতে না পারেন, যাতে তাঁকে বৃহৎ পুঁজির কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। লিখেছেন—ডা. কৌশিক দত্ত ৫

রাজ্যে নতুন ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন: বিশল্যকরণী নাকি হলাহল?

মার্চ মাসে রাজ্যের বিধানসভায় আইন হয়েছে West Bengal Clinical Establishment Act: 2017। নতুন আইনে চিকিৎসকরা আতঙ্কিত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। চিকিৎসকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন আইএমএ-র কেন্দ্রীয় সংগঠন এই আইনে নানা সংশোধনী চান। রাজ্যের আইএমএ এই আইনের সমর্থনে। সেই আইনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে বোঝা যায়, এই আইন যথেষ্ট নয়, দরকার সরকারি পরিকাঠামোর উন্নতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবাকে জনগণের অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে মেনে নেওয়া। জানাচ্ছেন—ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৯

চিকিৎসকের মুষ্টিযোগ এবং পশ্চিমবাংলার ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭

ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক খারাপ হওয়ার বিষয়টি সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা দরকার। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্দশা মানুষকে মরিয়া করে দিচ্ছে। মানুষের কাছে এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল আর ডাক্তার সমার্থক। জনসমক্ষে আসা হাসপাতালের একমাত্র মুখ হল ডাক্তারের মুখ। কাজে কাজেই ডাক্তাররা আক্রান্ত হবার ও হাসপাতালে ভাঙচুর হবার বাস্তব ভিত্তি থেকেই গেল। জানাচ্ছেন—ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য ১৩

ক্যান্সার ও তার চিকিৎসা নিয়ে যৎসামান্য

ক্যান্সার নিয়ে আমাদের যে ভয় আছে তা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু নিকটজনের কারও ক্যান্সার হয়েছে শুনলেই যে প্রবল অসহায়ত্ব আমাদের গ্রাস করে, সেটার তেমন কারণ নেই। সব ক্যান্সার একরকম মারাত্মক নয়, আর এদিক-ওদিক দৌড়ে সময় নষ্ট না করে ঠিকঠাক চিকিৎসা করালে প্রায় সব ক্যান্সারেই কিছুটা উপকার মেলে। লিখেছেন—ডা. প্রদীপকুমার মাইতি ৩৩

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

ডাক্তার—ভগবান না শয়তান — ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী ৪

ডাক্তারের ওপর আক্রমণ—অসন্তোষের কারণ — ডা. কৌশিক দত্ত ৫

রাজ্যে নতুন ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন: বিশল্যকরণী নাকি হলাহল — ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৯

চিকিৎসকের মুষ্টিযোগ এবং পশ্চিমবাংলার ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭ — ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য ১৩

জনস্বার্থে মোদীর নিদান—জেনেরিক প্রেসক্রিপশন কতটা মানুষের কাজে লাগবে? — ডা. পুণ্যব্রত গুণ ১৮

ডায়াবেটিসের জটিলতা এড়াতে নিয়মিত নজরদারি দরকার — ডা. পুণ্যব্রত গুণ ও ডা. মৃণ্ময় ২২

অথ DHA কথা — ডা. অলোক হালদার ২৬

ওষুধের পার্শ্বক্রিয়ায় প্রাণঘাতী চর্মরোগ — ডা. জয়ন্ত দাস ২৮

ফিটের ব্যামো — ডা. সুমিত দাশ ৩১

ক্যান্সার ও তার চিকিৎসা নিয়ে যৎসামান্য — ডা. প্রদীপকুমার মাইতি ৩৩

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন ৩৭

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া (Pre-eclampsia) ও তার প্রতিকার — ডা. অনিন্দিতা ৩৮

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে — প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৪১

সম্পূর্ণ দারিদ্রমুক্ত ও ক্ষুধাহীন পৃথিবী কি সম্ভব? — ডা. কাঞ্চন মুখার্জি ৪৫

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস কী? — ডা. রাহুল মুখার্জি ৪৮

বই পড়া

একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন? — প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৫১

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*র গ্রাহক হোন।
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315
সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

ক্লিনিক্যাল এসটাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৭ ও চিকিৎসকের ওপর হামলা

ল্যানসেট পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল, ২০১৭-তে ছাপা হল—Rising violence against health workers in India। তার শুরুতেই বলা হচ্ছে—ভারতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা কর্মস্থলে সবসময়েই দৈহিকভাবে আক্রান্ত হবার উৎকণ্ঠায় ভোগেন। দিল্লির একটি বড়ো হাসপাতালে ২০১৬-তে চালানো এক সমীক্ষার উল্লেখ করে বলা হল, ১২ মাসে শতকরা ৪০ জন রেসিডেন্ট চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে হিংসার মুখোমুখি হয়েছে। এদেশে প্রকাশিত *ন্যাশনাল মেডিক্যাল জার্নাল অফ ইন্ডিয়া*-র ২৫ জুন, ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে "Workplace violence against resident doctors in a tertiary care hospital in Delhi"। আবার, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএ জানাচ্ছে, এদেশের শতকরা ৭৫ জন চিকিৎসক তাদের সারাজীবনে কোনো-না-কোনো সময়ে মৌখিক বা দৈহিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। আইএমএ-র জাতীয় সভাপতি কে কে আগরওয়াল *ল্যানসেট*-কে বলেছেন, জুনিয়র ডাক্তাররা সবচেয়ে বেশি হিংসাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হয়।

তবে গণরোষের কারণ আছে। বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা-ওষুধ, হাসপাতালে ভর্তি হবার পরে রোগীকে দেখতে আসার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা, আগাম টাকা নেওয়া, এমনকী মৃত্যুর পরে টাকা না মেটানো পর্যন্ত মৃতদেহ আটকে রাখা। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা রোগীদের সময় দেন না, প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে ব্যস্ত। বেসরকারি ব্যবস্থা না থাকলেই যেন ভালো হত।

কিন্তু মানুষ সরকারি হাসপাতাল থাকতে বেসরকারি ব্যবস্থায় যান কেন? আসলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকে কোনো সরকার নজর দেননি। রোগী ডাক্তার পান না, পেলেও পরিস্থিতি একটু জটিল হলেই রোগী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উচ্চতর কেন্দ্রে, বিশেষ করে কলকাতায়, রেফারড হন। সেখানে জায়গা মেলে না। ফলে ঘটিবাটি বেচেও মানুষ বেসরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হন। বিপুল চাপের মুখে সরকারি উচ্চতর হাসপাতালে চিকিৎসা ভালো করে করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, রোগী পিছু দু-এক মিনিট সময়ও দেওয়া যায় না। রোগী ভাবে সে উপযুক্ত নজর পাচ্ছে না, ডাক্তার যেন রোগী সম্পর্কে উদাসীন এবং উদ্ধত অমানুষ। অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালের রোগী বাড়ে, তাদের ছাড়া মানুষের চলা অসম্ভব হয়ে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী টিভি-তে সরাসরি প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে বেসরকারি হাসপাতালের কর্মকর্তাদের ধমকেছেন, তাঁদের ব্যাবসাকে সেবামুখী করতে বলেছেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অধিকাংশ ডাক্তারই ভালো, রোগীর স্বাস্থ্য ও স্বার্থ রক্ষা করতে চান। মুখ্যমন্ত্রী ও বেসরকারি হাসপাতালের এই মুখোমুখির পরেই অসহায়, উদ্‌বিগ্ন চিকিৎসাপ্রার্থীদের রক্ষাকবচ দেবার জন্য ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা ১৭ মার্চ, ২০১৭-তে The West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Act, 2017 পাস করেছে।

এই আইন লাগু করতে-না-করতে একদিকে চিকিৎসা নিয়ে অজস্র অভিযোগ জমা পড়ছে। খবরের কাগজ সেগুলোর ঠিক রিপোর্ট করছে না, অনেক সাংবাদিক মেডিক্যাল বিষয়ে কিছু না জেনেই ডাক্তারের 'ভুল' ধরে লিখে দিচ্ছেন পাতার পর পাতা, লোকে সেই খবর তারিয়ে তারিয়ে পড়ছে। অন্যদিকে ডাক্তারদের ওপর ভুল চিকিৎসা বা অবহেলার অভিযোগে নির্বিচার আক্রমণ বেড়ে গেছে। কেউ কেউ মনে করছেন এইভাবে ডাক্তার মেরে সুচিকিৎসা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, মারধরের ঘটনাগুলোতে অনেক সময় এলাকার নানা ছোটোখাটো দাদা-দের নাম উঠছে, সস্তা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ডাক্তার পেটানো একটা সহজ রাস্তা বলে কারও কারও মনে হচ্ছে।

হাসপাতাল বেসরকারি হোক বা সরকারি, সাধারণের কাছে হাসপাতালের একমাত্র সহজপ্রাপ্য ও অসুরক্ষিত প্রতিনিধি হলেন ডাক্তারটি। তাই মুখ্যমন্ত্রী যতই বলুন অধিকাংশ ডাক্তার ভালো, সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থার সব ত্রুটিবিচ্যুতির দায়, বেসরকারি হাসপাতালের সমস্ত অতিলাভের দায় মানুষ ডাক্তারের ঘাড়ে ঠেলছেন। ডাক্তারদের কোন কাজ ঠিক আর কোনটা ভুল, সে নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। তবে হাতের সামনে থাকা ডাক্তার যে রোগীর ভরসা হলেও হতে পারেন, কিন্তু রোগীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারেন না—সেটা ভুলে যাওয়া হচ্ছে। ডাক্তার ভুল করে থাকলেও তার বিচার উত্তেজিত জনতা ঠিকভাবে করতে পারে না, এই সহজ সত্যটা মনে না রাখলে ডাক্তারের দুঃখ বাড়বে। কিন্তু ভীতিগ্রস্ত ডাক্তারের চিকিৎসা রোগীর সমস্যা বাড়াবেই, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

ডাক্তার—ভগবান না শয়তান

ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী

এখনকার ডাক্তাররা যে অর্থলোভী পিশাচের দল তা মুখ্যমন্ত্রীর বিচারসভা আর প্রচারমাধ্যমের বদান্যতায় একদম জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদিও পরে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বেশিরভাগ ডাক্তার খারাপ নন, কিছু ডাক্তার খারাপ, অফিসের আড্ডায়, লোকাল ট্রেনে সে কথার কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং মুখ্যমন্ত্রীর টিভি ঘোষণার পর চার মাসে অন্তত ১৯ জন ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, অপ্রকাশিত ঘটনা আরও বেশি। প্রকাশিত নিগ্রহের সংখ্যা আগের বছরের চার মাসের সংখ্যার চারগুণ। ফলত চিকিৎসক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সাম্প্রতিককালে আতঙ্কগ্রস্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় টিপ্পনি আর কর্মক্ষেত্রে অবিশ্বাস তাঁদের অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণাত্মক করে তুলেছে। জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁদের অনেক সময় ঝুঁকি নিতে হয়, এখন তাঁরা পিছিয়ে যাচ্ছেন। ঝুঁকি না নিলে রোগীর নিশ্চিত বিপদ, কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে বিফল হলে পাবলিক ও মিডিয়ার ‘ক্যাঙ্গারু কোর্ট’-এ বিপদ ডাক্তারের। এর ফলে রোগীরই ক্ষতি।

এরকম পরিস্থিতিতে হাসপাতাল থেকে ফিরে আমি আয়নায় মুখ দেখি আর ভাবি, আমি আর আমার সহকর্মীরা কি সত্যিই অতি অর্থলোভী দুর্নীতিগ্রস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন পিশাচ? যে ডাক্তারদের বিপদগ্রস্ত মানুষ ‘ভগবান’ বলে ডাকেন, সেই ডাক্তারকেই তাঁরা আবার শয়তান বলেন কেন? এই অবস্থা থেকে একজন চিকিৎসক কীভাবে মুক্তি পাবেন?

যে সমাজে ভূত আছে, সে সমাজে ওঝাও থাকবে। তাই যে দেশে ভগবান আছেন সে দেশে শয়তান থাকবেই। ভগবান প্রাণ দেন, মঙ্গল করেন, শয়তান প্রাণ কাড়ে, ক্ষতি করে। চিকিৎসকের ভূমিকা যেহেতু এই দুই ভূমিকার মধ্যে চলাফেরা করে, তাই মানুষের চোখে, বিশেষ করে অসহায় অসচেতন মানুষের কাছে, চিকিৎসক কখনো ভগবান আর কখনো শয়তান হয়ে ওঠেন।

দারিদ্রজর্জর শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের এই দেশে সরকার প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। সরকারি পরিকাঠামোর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। চিকিৎসার খরচ বেড়ে চলছে, আর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাব্যবস্থা, শয্যাসংখ্যা খুব কম। জটিল বা প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত দরিদ্র মানুষের পরিবারের অবস্থা ভয়াবহ। একদিকে সরকারি ব্যবস্থা নেই, অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থার বিপুল খরচ নাগালের বাইরে। সরকারি অব্যবস্থা আর কর্পোরেট পুঁজির লাভ—এ দুয়ের জাঁতাকলে আটকা পড়ে রোগীর পরিজনেরা ছটফট করে, বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। এমন সময় যদি রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে, বা মৃত্যু হয়, তাহলে বহু ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটে। হাসপাতাল ভাঙচুর, ডাক্তার নার্স নিগ্রহ—এসব তখন দূরদর্শনে ‘ব্রেকিং নিউজ’ হয়। ভাঙচুর পেছনে প্রায়শই আঞ্চলিক তোলাবাজ বা রাজনৈতিক মাতব্বরদের ইন্ধন থাকে। অন্যদিকে চিকিৎসকের সময়াভাব, খোলামেলা কথাবার্তায় অনীহা বা অপটুতা কিছু ক্ষেত্রে আগুনে ঘি ঢালে। তবে প্রধান কারণ সরকারি পরিকাঠামোর অভাব, সেখানে সুযোগ না পেয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে বাধ্য হওয়া, রোগ ও চিকিৎসার অন্তর্লীন অনিশ্চয়তা সম্পর্কে অজ্ঞতা, ও চিকিৎসার খরচের বিপুল বৃদ্ধি।

বর্তমানে চাল ডাল তেলের মতো চিকিৎসাকেও একটা পণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু ক্রেতার চাল-ডালের দাম আগেই জানা থাকে, নিজের পছন্দ অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন জিনিস কিনবেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্রেতা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ওষুধ, পরীক্ষানিরীক্ষা, অপারেশন এসব ‘কিনতে’ পারেন না। তাঁকে চিকিৎসক নামক এক ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়। তাই চিকিৎসকের ওপর আস্থা আর বিশ্বাসের প্রশ্ন আসবেই। যখন ফল ভালো হয় তখন চিকিৎসকের ওপর আস্থা বাড়ে, যখন ফল খারাপ হয় তখন আস্থা কমে। রোগ ও চিকিৎসার নিজস্ব ধর্মেই যে ফল অন্যরকম হয়েছে, সেটা তাঁরা বোঝেন না। যতদিন চিকিৎসা পণ্য থাকবে, কেনাবেচা চলবে, ততদিন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের খেলা বেড়ে চলবে। ফলে ডাক্তার ভগবান আর শয়তান এই দ্বৈত ভূমিকার টানাপোড়েনে ভুগবেন।

অতএব স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি না হলে, চিকিৎসার পরিকাঠামো ভালো না হলে, জনগণের চিকিৎসার অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে, রোগচিকিৎসার খরচ বাড়বে, আর অধিকাংশ মানুষ চিকিৎসা নিতে পারবেন না, কিন্তু বাইরে থেকে দেখবেন দেদার পয়সা খরচ করলে ‘অন্যরকম’ চিকিৎসা পাওয়া যায়। তাঁদের মনে হবে, বোধহয় পয়সা ফেললে সব কিছু সম্ভব, বোধহয় ডাক্তার বেশি পয়সা পেলেই যমরাজকেও ঠেকাতে পারে, বোধহয় সে পয়সার লালসায় মানুষ মেরে ফেলছে। সে ডাক্তারের ওপর চড়াও হবে, নিদেনপক্ষে ডাক্তার বা হাসপাতালের ওপর আক্রমণ ঘটলে সে খুশি হবে। এমন অবস্থায় গুণ্ডা-মাফিয়া-রাজনৈতিক দাদারা জানবে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তারকে মেরে হিরো হওয়া যায়, সুতরাং নিগ্রহ চলতে থাকবে।

এমন অবস্থায় চিকিৎসকেরা যদি সত্যিই নিরাপত্তা চান, মানুষের জন্য চিকিৎসা নির্ভয়ে করতে চান, তাঁদের সব মানুষের চিকিৎসা পাবার অধিকারের জন্য আওয়াজ ওঠাতে হবে। সরকারের কাছে কেবল নিজের নিরাপত্তার দাবি করলে হবে না, মানুষের স্বাস্থ্যের দাবি একই ভাবে করতে হবে। মানুষকে বোকা ভাবার কারণ নেই, তাঁরা যদি দেখেন চিকিৎসকরা তাঁদের পক্ষে, তাঁরা শেষপর্যন্ত চিকিৎসকের পক্ষে যাবেন। কোনো মিডিয়া, কোনো রাজনৈতিক দল তাঁদের ব্যবহার করতে পারবে না। চিকিৎসকের নিরাপত্তা, সম্মান ও কর্মক্ষেত্রে সুপরিবেশের দাবি তাই মানুষের স্বাস্থ্যের দাবির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে দীর্ঘস্থায়ী লাভ অসম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী, এমবিবিএস, ডিএনবি, এমসিএইচ, বক্ষশল্যচিকিৎসক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী।

ডাক্তারের ওপর আক্রমণ

অসন্তোষের কারণ

ডা. কৌশিক দত্ত

চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে কোনো এক সময় যে পাশ ফিরি, সে তো অসন্তোষের ফলেই, পিঠ ব্যথা হয়ে যায় বলেই। নইলে কে আর নড়াচড়া করত পরিশ্রম করে? এই যে আমরা সবাই মিলে বেশ ভাবিত হয়েছি চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে (না, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে এখনও তেমন ভাবনা গণস্তরে চোখে পড়ছে না, শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েই ব্যস্ততা), সেও তো অসন্তোষের খোঁচা খেয়েই। চিকিৎসাবিজ্ঞান রে রে করে উন্নয়নের পথে ধেয়ে চলেছে নোবেল প্রাইজ-টাইজের ঘুঙুর বাজিয়ে, ওদিকে রোগীদের একটু বাজিয়ে দেখলে কেবলই রাগত রাগের তার সপ্তকের কড়ি মা ছাড়া অন্য কোনো সুর বেরোচ্ছে না। অগত্যা খুঁজে দেখার পালা, সুর কোথায় কাটল? অগত্যা আত্মবিশ্লেষণ। গরজ বড়ো বালাই। পরিসংখ্যানসহ মূল্যবান নিবন্ধ অনেকে লিখবেন। আমার কাজ হল এলোমেলো কথা বলা; মনে যা আসছে, তা অপরিমার্জিত রূপে বলে ফেলা।

অসুস্থতা, স্বাস্থ্য ও রোগ সংক্রান্ত রহস্য, এবং মৃত্যুভয় সাধারণ মানুষকে এক চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায় দাঁড় করায়। একই সঙ্গে চিকিৎসককে (হয়তো তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই) তুলে দেয় ক্ষমতার অত্যুচ্চ শিখরে, যেখান থেকে নেমে আসা খুব মুশকিল।

চিকিৎসকেরা অনেকে বলছেন, এ হল হিন্দি সিনেমার মাস্টার দীননাথ সিন্ড্রোম। সৎ স্কুল মাস্টারের সততার একমাত্র পরিচয় তার দারিদ্র্য, সন্তানদের ভরণপোষণে অক্ষমতা, আত্মরক্ষা করতে না পারা। তাঁর হেরে যাবার ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর রাগী যুবক পুত্রের ভায়োলেন্স নির্ভর সমাজবদলের গল্প। তাঁর জীবনের সমগ্র যাপন একই রেখে তার গা থেকে দীনতার রোঁয়া ওঠা পুরনো কম্বলটুকু সরিয়ে নিলে আমাদের সামাজিক মনের বিচারালয়ে তাঁর নিষ্ঠার আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। একাহারী ভিষক আর বল্কলপরিহিত বুনো রামনাথের ফ্যান্টাসিতে অভ্যস্ত মন সচ্ছল শিক্ষাবিদ বা চিকিৎসককে সন্দেহ করবেই। যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়, বিশেষত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সিংহভাগ যেহেতু আর্থিক, চিকিৎসা সংক্রান্ত বেশিরভাগ আলোচনাতেই 'ওঁ শান্তি'-র মতো এসে পড়ে 'মোটা অঙ্কের ভিজিট'-এর প্রসঙ্গ। অস্বীকার করার উপায় নেই, বাবা-মায়েরা প্রাণপণ অত্যাচারে ছেলেমেয়েদের ডাক্তার বানাতে চান মূলত স্বচ্ছলতার লোভেই !

অযৌক্তিক না হলেও এই তর্ক অসম্পূর্ণ। সকলেরই যে পয়সা বা সাফল্য দেখে চোখ টাটাচ্ছে, এমন ধরে নেওয়ার পিছনে একরকম অহংকার আছে। আর আছে আত্মাবলোকনে অনিচ্ছা। বুনো রামনাথের পাশাপাশি রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত সচ্ছল পণ্ডিতবর্গেরও সামাজিক সম্মান চিরকাল অত্যুচ্চ থেকেছে। সবচেয়ে বড়ো বিলিতি গাড়ি থেকে নামা কোট পরা ডাক্তারের ওপরেই সর্বাধিক ভরসা করেন বেশিরভাগ মানুষ, যাঁরা বাজারের নিয়ম মেনে রোগী সত্তা হারিয়ে ক্রমশ উপভোক্তা বা ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। এই বাজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ থাকবেই, কিন্তু যে মানুষ মনেপ্রাণে কাস্টমার, কোম্পানির ছাপ দেখে জামা কেনেন, তাঁর ক্ষোভের একমাত্র কারণ জিনিসের (এক্ষেত্রে ডাক্তারের) দাম হতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও গুণমান বিষয়ে অতৃপ্তি বা নিদেনপক্ষে ঠকে যাবার ভয় কাজ করছে। সেই অতৃপ্তি আর ভয়ের কারণ বোঝা জরুরি। পাশাপাশি এটাও বলা দরকার যে আমাদের রাজ্যের বৃহৎ সংখ্যক চিকিৎসক কেন্দ্রীয় সরকারি করণিকদের তুলনায় কম বেতন পান।

আমরা শ্রদ্ধাটাকে গুরুত্ব দিতে অভ্যস্ত এবং ধরে নিই যে এই শ্রদ্ধা আসলে ভালবাসার অন্য রূপ। বাস্তব সর্বদা তেমন নয়। . . . চিকিৎসকের প্রতি সম্ভ্রমের উৎস হল ভীতি . . . রোগের প্রতি, মৃত্যুর প্রতি, এবং চিকিৎসা নামক রহস্যময় (ক্ষেত্রবিশেষে আতঙ্কজনক) তলোয়ারটি মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণহস্তে ধারণ করে আস্ফালন করছেন যিনি, তাঁর প্রতিও।

দোষারোপের পরিচিত খেলাটার ফাঁদে পড়ে যাবার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক, চরিত্রগতভাবে চিকিৎসা পেশা কোথায় আলাদা আর কোথায় সমস্যাজনক? অসুস্থতা, স্বাস্থ্য ও রোগ সংক্রান্ত রহস্য,

এবং মৃত্যুভয় সাধারণ মানুষকে এক চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায় দাঁড় করায়। একই সঙ্গে চিকিৎসককে (হয়তো তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই) তুলে দেয় ক্ষমতার অত্যুচ্চ শিখরে, যেখান থেকে নেমে আসা খুব মুশকিল। সেই শৃঙ্গের নির্বাসনে প্রত্যাশার পাহাড়ের ওপর প্রতি মুহূর্তে পতনের ভয় নিয়ে চিকিৎসক খুঁজতে থাকেন হারিয়ে যাওয়া মইটা, কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারেন না কাউকে, কারণ আত্মপ্রত্যয় বা প্রত্যয়ের ভান অস্তিত্বের সঙ্গে কবচ-কুণ্ডলের মতো সেঁটে রাখা ছাড়া তাঁর অন্য উপায় নেই। অত উঁচু থেকে নীচের মানুষগুলোকে যেমন অনেকে লিলিপুটের মতো দেখেন, তেমনি নীচ থেকে টঙে চড়া লোকগুলোর মুখের রেখা দেখা যায় না, শুধু স্যুট-বুট দেখা যায় আর তাদের দেখতে লাগে সন্দেহজনক ‘অপর’-এর মতো।

বাজারের প্রয়োজন তাই উপভোক্তার বিশ্বাসগুলো ভেঙে দেওয়া; তার চাহিদা বাড়ানোই শুধু নয়, তাকে একাকী, অসহায়, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং আগ্রাসী করে তোলা। একই সঙ্গে শিল্পী থেকে শিক্ষক, স্তন্যদাত্রী থেকে চিকিৎসক, সবাইকে বিক্রেতায় পরিণত করাও আবশ্যক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানুষের জীবন ও তার যাপনের উপর চিকিৎসক যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম, তা একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সন্দেহ উদ্রেক করে। আমরা শ্রদ্ধাটাকে গুরুত্ব দিতে অভ্যস্ত এবং ধরে নিই যে এই শ্রদ্ধা আসলে ভালবাসার অন্য রূপ। বাস্তব সর্বদা তেমন নয়। ভালবাসা জন্ম নেবার সুযোগ পায় না উপযুক্ত আঁতুড়ঘরের অভাবে। চিকিৎসকের প্রতি সম্ভ্রমের উৎস হল ভীতি . . . রোগের প্রতি, মৃত্যুর প্রতি, এবং চিকিৎসা নামক রহস্যময় (ক্ষেত্রবিশেষে আতঙ্কজনক) তলোয়ারটি মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণহস্তে ধারণ করে আস্ফালন করছেন যিনি, তাঁর প্রতিও। গ্রহীতার এই ভয় ও সম্ভ্রম, এবং নিজের নলেজ প্রিভিলেজ কাজে লাগিয়ে চিকিৎসক অনেক কিছু পারেন, বলা ভালো ‘পারতেন’ গত কয়েক হাজার বছর ধরে। এই অসাম্যের ভিত্তিতেই উপার্জিত হয়েছে সম্পদ ও মর্যাদা, অর্জিত হয়েছে অবাস্তব প্রত্যাশা, পাশাপাশি এসেছে নিখুঁত চরিত্র এবং আকাশ-সমান প্রসারিত হৃদয় বহন করার দায়, যা অধিকাংশ পেশার ক্ষেত্রে থাকে না।

এভাবে চলছিল, মূলত বিশ্বাসে ভর করে। কে না জানে, চিকিৎসকের নিদানকে বেদবাক্যজ্ঞানে মেনে চলার অভ্যাসের দরুন বহু অপচিকিৎসা প্রশ্রয় পেয়েছে। গ্যালেন সাহেবের হাতে জনপ্রিয় হওয়া ‘রক্তমোক্ষণ’ (Blood-letting)-এর মতো অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সহস্রাব্দকাল ইউরোপ শাসন করেছে, অথচ তার দ্বারা কোনো রোগীর উপকার হয়েছে (মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়ে যন্ত্রণা লাঘব ছাড়া!) বলে মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। অবশ্যই গরিষ্ঠ সংখ্যক চিকিৎসক/বৈদ্য অন্তত মানসিকভাবে তাঁদের ওপর মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে চাইতেন বলে ভাবা যায়। সেই চেষ্টা থেকেই এসেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি। পাশাপাশি ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এসেছে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, কায়েম হয়েছে সমাজ ও মানবমনের উপর বাজারের নিয়ন্ত্রণ।

পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা যেভাবে চলত, তাতে বিশ্বাসের বড়ো ভূমিকা ছিল। এর ফলে চিকিৎসক পরিষেবা প্রদানকারীর বদলে দেবতাসুলভ উচ্চাসনে অতিরিক্ত সম্মান নিয়ে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছেন এবং তাঁর স্বেচ্ছাচারী হবার সম্ভাবনাও থেকেছে, যা খারাপ। পাশাপাশি বিশ্বাসের বাতাবরণের কিছু সদর্থক ভূমিকাও ছিল। কিন্তু আস্থা বা বিশ্বাস মানুষকে উপভোক্তা হিসেবে স্থবির করে। ক্রেতার একনিষ্ঠতা প্রতিযোগিতাকে অনেকাংশে মঞ্চচ্যুত করে, যা বাজার অর্থনীতির চরিত্রবিরোধী। বাজারের প্রয়োজন তাই উপভোক্তার বিশ্বাসগুলো ভেঙে দেওয়া; তার চাহিদা বাড়ানোই শুধু নয়, তাকে একাকী, অসহায়, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং আগ্রাসী করে তোলা। একই সঙ্গে শিল্পী থেকে শিক্ষক, স্তন্যদাত্রী থেকে চিকিৎসক, সবাইকে বিক্রেতায় পরিণত করাও আবশ্যক। সুনিপুণভাবে এই সবের আয়োজন চলছে বিগত শতক (বিশেষত শেষ কয়েক দশক) ধরে। আইনসভা থেকে সংবাদ পরিবেশক, সবাই মিলে যে কনসার্ট গাইছেন, তার মূল উদ্দেশ্য সমাজব্যবস্থায় তথা মানুষের মনে এই নতুন (অ)মানবিক সম্পর্কের বীজ গভীরভাবে বুনে দেওয়া।

বিষবৃক্ষের চারাটিতে সবে নতুন পাতা আসতে শুরু করেছে। আজ যারা নতুন ডাক্তারি পাশ করে হঠাৎ এই অবিশ্বাসের বাতাবরণে নিজেদের আবিষ্কার করছে, তারা বিস্মিত হয়ে ভাবছে, “আমরা কী দোষ করলাম?” এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে তারা তো ছিল না, কিন্তু ইতিহাস ছিল, বীজ বপন ছিল, তাকে খেয়াল না করার ভান করে জলসিঞ্চন ছিল।

তাই নানা সময়ে বিভিন্ন আইনের দ্বারা এটা নিশ্চিত করা হয়েছে বা হচ্ছে,যাতে ছোটো পরিসরে একাকী চিকিৎসক নিজের পেশায় টিকে থাকতে না পারেন, যাতে তাঁকে বৃহৎ পুঁজির কাছে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হয়।

বাজারের বপু বিস্তারের জন্য ক্রেতার সংখ্যা বাড়াতে হয়। তার জন্য লগ্নি ও বিক্রয়ের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া এবং বিজ্ঞাপনের দ্যুতিতে ‘উন্নত’ জীবন, বিলাস বা পরিষেবার প্রতি ক্রেতাকে মোহগ্রস্ত করার পাশাপাশি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের হাড়-পাঁজর আলগা করে ফেলতে হয়। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও দরিদ্র আর মধ্যবিত্তের মাথা থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে হয় রাষ্ট্রের ছাতা, এমনভাবে যাতে তাঁরা সুস্থতা ক্রয় করতে বাধ্য হন। একইসঙ্গে সুস্বাস্থ্য বজায়

রাখার জীবনশৈলীভিত্তিক সাধারণ প্রণালী এবং রোগ প্রতিষেধমূলক পদক্ষেপগুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ক্রয়যোগ্য 'অত্যাধুনিক' চিকিৎসার দিকে। এভাবে এক বিশাল সংখ্যক অপারগ মানুষ স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা নামক পণ্যটির ক্রেতা হতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব বিক্রয় করতে বাধ্য হবার পর্যায়ে পৌঁছান। সংবাদ ও বিনোদনের বিভিন্ন গণমাধ্যম, রাজনৈতিক দল এবং দেশ ও রাজ্যগুলির বিভিন্ন সরকার, সবাই মিলে এই প্রক্রিয়ায় ছন্দোবদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে। ইতস্তত ব্যতিক্রম অবশ্য থেকেছে, সমসত্ত্ব কিছু তো হয় না।

রোগী ক্রেতা এবং চিকিৎসক বিক্রেতায় পরিণত হলে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বণিক চরিত্রের জন্ম হবেই। তাও ব্যক্তি চিকিৎসকের ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার একটা সীমা আছে, কারণ রোগী এবং তাঁর পরিবার 'পরিচিত' হয়ে ওঠেন, ক্রমশ এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন, যখন তাঁদের আর্থসামাজিক বাস্তবতার কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বই আর বাজারের শর্তগুলির কথা মাথায় রাখা সম্ভব হয় না। তাই নানা সময়ে বিভিন্ন আইনের দ্বারা এটা নিশ্চিত করা হয়েছে বা হচ্ছে,যাতে ছোটো পরিসরে একাকী চিকিৎসক নিজের পেশায় টিকে থাকতে না পারেন, যাতে তাঁকে বৃহৎ পুঁজির কাছে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হয়। এসব ব্যবস্থা যখন হয়েছে, তখন ডাক্তারকে টাইট দেওয়া হচ্ছে ভেবে অনেক সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয়েছেন/হচ্ছেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি তাঁদের পাড়ার অমুক ডাক্তারকেও 'ম্যাক্সিমাইজেশন অব প্রফিট'-এর কারখানায় শ্রমিক বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। পরিচিত সেই ডাক্তারটি মানুষ হিসেবে যেমনই হন, তাঁর হাতদুটো ধরে নিজের কষ্টের কথা বলে কিছু সুরাহা হত। এখন দুনিয়াব্যাপী এই চিকিৎসাযন্ত্রের কোথায় হাত আর কোথায় বা হৃদয়?

পরিস্থিতি এই নতুন ব্যবস্থার দিকে বাহ্যিকভাবে ঠেলে দিলেও মানসিক ও আত্মিক স্তরে নিজেদের চিকিৎসক সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারার দায় চিকিৎসকদেরও নিতে হবে। প্রয়োজন, চাহিদা, লোভের ক্ষীণ সীমান্তরেখা রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষের নিজেরই। দায় আমাদের প্রশিক্ষণেরও। শরীরকে জানতে যে পরিমাণ পড়াশুনা এবং কাজ করতে হয়েছে, তার কণামাত্র চেষ্টা ছিল না মানুষকে চেনার বা চেনানোর। চিকিৎসা আসলে কিছুটা বিজ্ঞান আর অনেকটা শিল্প, অথচ আমরা বুঝতে শিখিনি শারীরবিজ্ঞানের বাইরে মানবমনের জটিলতা বা তার সৌন্দর্য। ঠিকমতো বোঝাতেও শিখিনি, আমরা কী ভাবছি বা করছি। ফলে চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কের অ্যাকিলিস হিল হয়ে দাঁড়ায় কমিউনিকেশন, বলা ভালো, তার অভাব। আরেকটু বেশি করে পরস্পরকে চিনলে, কথা বললে, খোলামেলা হলে, বেশ কিছু সমস্যা মিটতে পারত। অবশ্যই সব সমস্যা মিটত না তাতে। বোঝাতে গিয়ে দেখেছি, সকলে বুঝতে রাজি হন না।

যে বিজ্ঞান নিয়ে এত মাতামাতি, তার সম্বন্ধে দু-একটা কথা। প্রথমত, চিকিৎসাবিজ্ঞান বর্তমান চেহারায় ভয়ানক রিডাকশনিস্ট। মানুষের সমগ্র সত্তাকে শরীরে, শরীর থেকে একটি অঙ্গে (যেমন হার্ট), অঙ্গ থেকে অঙ্গটির একটি নির্দিষ্ট অংশে (যেমন হার্টের ভালব) সংকুচিত করে আনাই আমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এভাবেই আমরা এগোতে শিখি এবং তা অনেকাংশে কার্যকর। কিন্তু এই ক্ষুদ্রায়িত পরিসরে সমগ্র মানুষটির জায়গা হয় না, আশ্রয় খুঁজে পায় না তার পরিচয়, তার সর্বাঙ্গীণ (অ)সুখ। ফলে রোগ সারলেও রোগী আর তার পরিবারের মনে অতৃপ্তি থেকে যেতে পারে। রোগ না সারলে সেই অতৃপ্তি প্রকাশিত হতে পারে বিকৃত আকারে।

দ্বিতীয়ত, এভিডেন্স বেসড মেডিসিন (সাক্ষ্যনির্ভর চিকিৎসা) একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, তা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা দেয়, নইলে যে যার ইচ্ছামতো যেকোনো ওষুধে যেকোনো অসুখের চিকিৎসা করতে পারত, হয়তো 'রক্তমোক্ষণ'-এর মাসতুতো ভাইয়ের শরণাপন্ন হত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাই প্রমাণ বা এভিডেন্সের কোনো বিকল্প নেই। আবার এর হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ফলে চিকিৎসা পদ্ধতি শুধু যে যান্ত্রিক হচ্ছে তাই নয়, সাক্ষ্য-তথ্য নথিবদ্ধ করতে এবং প্রচার করতে সক্ষম কিছু প্রভূত ক্ষমতাধর আকাদেমি, জার্নাল, ল্যাবরেটরি বা বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, এরা সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্মাণ বা সৃজন করতেও সক্ষম এবং এদের নৈতিকতায় অন্ধের মতো আস্থা রাখার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।

তৃতীয়ত, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির কুফল আমরা নিয়মিত ভোগ করি। অস্বীকার করার প্রশ্নই নেই, যে চিকিৎসার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অতি দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। আমরা এখন অনেক বেশি গভীরে গিয়ে রোগের কারণ নির্ধারণ করতে পারি। আগে যাকে একটা রোগ ভাবা হত, তার মধ্যে এখন পাঁচরকম শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব, যাদের চিকিৎসার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। স্ট্রোক চিকিৎসা, হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা বা জটিল হয়ে যাওয়া নানান রোগের 'ক্রিটিকাল কেয়ার'-এর ক্ষেত্রে এখন বিভিন্ন নতুন ওষুধ, উন্নত যন্ত্রপাতি, অজস্র খুঁটিনাটি মাপজোখের ভিত্তিতে চিকিৎসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন, ইত্যাদি এখন স্বাগত বাস্তব। এসবের দ্বারা মৃত্যুর হার সত্যিই কিছু কমেছে এবং সুস্থ হবার সম্ভাবনা খানিক বেড়েছে। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি বেড়েছে দুটো জিনিস . . . চিকিৎসার খরচ (নানা নতুন

হাল ছেড়ে দেবার আগে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিয়মের বেড়া ডিঙিয়ে শেষ চেষ্টা করার বদলে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি শব্দ খাতায় লিখে রাখা, আত্মীয়দের ক-টার সময় কী জানানো হয়েছে তা নথিবদ্ধ করে সই করিয়ে নেওয়া, বইতে যেটুকু লেখা আছে তার বাইরে যাবার চেষ্টা না করা, দায়িত্ব নিজের কাঁধে না রেখে অন্যান্য স্পেশালিস্টদের রেফার করে দেওয়া

পদ্ধতি এবং ওষুধ প্রয়োগ করার খরচ বিপুল) এবং আধুনিক চিকিৎসা থেকে মানুষের প্রত্যাশা। একদিকে ‘এভিডেন্স বেস’(সাক্ষ্যপ্রমাণ), বিভিন্ন গাইডলাইন এবং আইনের দ্বারা নিশ্চিত করা হচ্ছে যে আধুনিক বলে গৃহীত (মহার্ঘ্য) চিকিৎসাটি প্রয়োগ না করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, পাশাপাশি প্রচারের ফলে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে একবার বড়ো হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছতে পারলে সব মানুষের সব রোগ সারিয়ে ফেলা সম্ভব, তাও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। অতঃপর ভাবুন, সেই লাখ টাকার চিকিৎসাটি করার পর যদি আশানুরূপ ফল না হয়, তাহলে? মানুষের তৃপ্তি নির্ধারিত হয় প্রত্যাশা আর ফলাফলের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের দ্বারা। যে পাশ করার জন্য কাতর ছিল, সে ফার্স্ট ডিভিশন পেলে মিষ্টি খাওয়াবে, আর যে ফার্স্ট হবে বলে জেদ ধরেছিল, সে থার্ড হয়ে আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে। জ্বর রোগে দুর্গার মৃত্যুতে সর্বজয়ার মনে যতটুকু বেদনা বা ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি ক্ষোভ-ক্রোধ সঞ্চারিত হতে পারে আজকের দিনে কোনো মেয়ের মনে, তাঁর আশি বছর বয়স্ক মা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে হাসপাতালের আইটিইউ-তে প্রাণত্যাগ করলে। কারণ প্রত্যাশার তারতম্য। প্রত্যাশা আমরাই জাগিয়েছি, হয়তো সম্মান বা বাণিজ্যের লোভে। তাই ক্রোধ, অভিযোগ। ভগবান ভদ্রলোক নীৎসের হাতে খুন হয়ে বেঁচে গেছেন, কর্পোরেট হাসপাতালের মালিকের নাম কেউ জানে না, অতএব পড়ে থাকে ডাক্তার। যমের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বেচারা খেয়ালই করে না, কখন যমরাজ তার হাতে গদাটা ধরিয়ে দিয়ে রোগীকে উঠিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। ক্যামেরার ফ্রেমে এখন সে একা মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে রক্ত। দর্শকমণ্ডলি সহজেই বুঝে নেন, মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

নিদারুণ অবিশ্বাসের পরিবেশে ভালো কাজ হয় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, জটিল রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় এবং দ্রুত চিকিৎসার ক্ষেত্রে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ভূমিকা বিরাট। রোগী দেখার সময় পূর্ণ মনোযোগ রোগীর দিকে দিতে পারলে তবেই মনের সবটা, ষষ্ঠেন্দ্রিয় সমেত, কাজ করে। যদি অর্ধেকটা মন পড়ে থাকে নিজের পিঠ বাঁচানোর দিকে, রোগী দেখার সময় যদি ভাবতে হয় “এই রোগী নিয়ে কী ধরণের কেস খেতে পারি” বা “এর বাড়ির লোক ঝামেলা করতে পারে কিনা”, তাহলে মনের সেই আশ্চর্য রত্নভাণ্ডারে তালা পড়ে যায়, বদলে সামনে আসে কৈকেয়ীর গোঁসাঘর আর মন্থরার ফিসফাস। রোগীকে ভালোবেসে দেখা, তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে “কিচ্ছু হবে না, আমি তো আছি” বলা, বা হাল ছেড়ে দেবার আগে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিয়মের বেড়া ডিঙিয়ে শেষ চেষ্টা করার বদলে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি শব্দ খাতায় লিখে রাখা, আত্মীয়দের ক-টার সময় কী জানানো হয়েছে তা নথিবদ্ধ করে সই করিয়ে নেওয়া, বইতে যেটুকু লেখা আছে তার বাইরে যাবার চেষ্টা না করা, দায়িত্ব নিজের কাঁধে না রেখে অন্যান্য স্পেশালিস্টদের রেফার করে দেওয়া, ইত্যাদি। যেন রোগীকে নয়, নিজেকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসা করছি। এভাবে আর যাই হোক, সুচিকিৎসা হয় না। যাঁদের প্রতি সমানুভূতি লাভ করার কথা, তাঁদেরকেই সম্ভাব্য আক্রমণকারী বা আদালতের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে হবে বলে যদি জানতাম, তাহলে আমরা অনেকেই হয়তো অন্য পেশা বেছে নিতাম, যেখানে এর চেয়ে কম পরিশ্রমে এর চেয়ে বেশি উপার্জন করতে পারতাম। চিকিৎসা পেশার একটা নেশা আছে, যেটা চলে গেলে আমাদের অনেকের জন্যেই কাজটি অর্থহীন হয়ে যায়।

বরং প্রয়োজন ছিল এমন এক পরিসর, যেখানে কিছু না জানার কথা বা বুঝতে না পারার কথা খোলাখুলি বলতে পারব, আরও পাঁচজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করার মধ্যে যেখানে অসম্মান থাকবে না। যেখানে নিজের ভুল বুঝতে পারলে চাপা দেবার প্রয়োজন থাকবে না, বরং তা স্বীকার করে শোধরানোর চেষ্টা করা যাবে চটপট, যেখানে ভুল বা ব্যর্থতা মানেই অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া (blameworthiness) নয়। যেখানে আন্তরিকতা, সততা, নিষ্ঠা মূল্যবান। যেখানে নিজের কান্না,

চিকিৎসকদের বিশেষ মনোযোগী হতে হবে আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধিতে। নীচে নেমে আসতে শিখতে হবে, কথা বলতে শিখতে হবে। হাত বাড়াতে শিখতে হবে।

নিজের দুর্বলতা, নিজের হেরে যাওয়া নিয়ে পাশাপাশি বসতে পারেন সন্তানহারা পিতা আর সেই সন্তানকে বাঁচাতে না পারা চিকিৎসক . . . পরস্পরকে দিতে পারেন মন উজাড় করে ভেঙে পড়ার জায়গা এবং জোগাতে পারেন আরেকবার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি।

গাফিলতি কি তবে সত্যি থাকে না? অবশ্যই থাকে। লোভ কি নেই? আছে বলেই তো সমস্যা। চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন কি নেই? অবশ্যই আছে। চিকিৎসা হওয়া উচিত মানবিক। তার উপর নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তির ভিত্তিতে পরিবর্তনযোগ্য (কারণ বিজ্ঞান পরিবর্তনের উপরেই ভর করে বেঁচে থাকে), বাস্তবসম্মত এবং মানবিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক। সেটাকে বিষিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে বহুদিন ধরেই। এই অপচেষ্টা আটকানোর জন্য সাধরণ মানুষ, বিচার ব্যবস্থা, সৎ সাংবাদিক, সমাজকর্মী এবং সরকার, সকলকেই সচেতন হতে হবে। চিকিৎসকদের বিশেষ মনোযোগী হতে হবে আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধিতে। নীচে নেমে আসতে শিখতে হবে, কথা বলতে শিখতে হবে। হাত বাড়াতে শিখতে হবে। অসহিষ্ণুতা একটি যুগলক্ষণ, যা সর্বব্যাপী আজকের পৃথিবীতে। রোগী-চিকিৎসক উভয় পক্ষকেই সে কথা বুঝতে হবে এবং তার প্রতিকারে সচেষ্ট হতে হবে। শেষ অব্দি মানুষই তো পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

প্রথম প্রকাশ গুরুচণ্ডালি ওয়েব ম্যাগাজিনে (জুলাই ২০১৭)।

ডা. কৌশিক দত্ত, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

রাজ্যে নতুন ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন: বিশল্যকরণী নাকি হলাহল

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত

শত শত ডাক্তারবাবু সাদা অ্যাপ্রন পরে, গলায় চিকিৎসকদের গোত্র চিহ্নিতকারী উপবীতের মতো স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে, হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বা মুখে কালো কাপড় বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়েছেন নানা সংগঠনের নামে। এমনকী যেসব মহামান্য চিকিৎসকদের চকচকে কর্পোরেট হাসপাতালের আই.সি.ইউ, অপারেশন থিয়েটার বা টয়োটা-মার্সিডিজের বাতানুকূল অভ্যন্তর ছাড়া জনগণ কখনো দেখেননি, হাসপাতালে রোগী ভর্তি করেও যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, অস্ত্রোপচার করে 'ফিজ'-এর টাকাটা বুঝে নিয়েই যারা উধাও সেইসব বড়ো ডাক্তারবাবুদেরও চৈত্র বৈশাখের কাঠফাটা গরমে কালারপ্লাস বা অ্যারোর জামা, রে ব্যানের রোদচশমা ল্যাকস্টের জুতো পরে কলেজ স্ট্রিট—মহাত্মা গান্ধী রোড বা মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পদতলে ঘামতে ঘামতে হাঁটতে দেখে আমজনতা তো অবাক! এর পাশাপাশি ভিড়ের একটু পিছনের দিকে লুকিয়ে-চুরিয়ে আছেন সরকারি চিকিৎসকরাও—যাঁদের অনেকে গাছেরও খান তলারও কুড়োন। বেসরকারি ভাই-দের মতো অকুতোভয় হওয়া তাদের মুশকিল—পাছে রাজকোষে পড়ে লোভনীয় পিজি হাসপাতাল থেকে রায়গঞ্জ বা বড়জোড়ায় বদলি হতে হয়। তৃতীয় পক্ষ সরকারের অনুগামী বলে নিজেদের তুলে ধরছেন। নতুন আইনের সমর্থনে হুমকিসহ বিবৃতিও দিচ্ছেন—কিন্তু এরা শাসকদলের অনুগত রাজনৈতিক নেতা; চিকিৎসক পরিচয়টা গৌণ। এদেরও একটা অংশ তলে তলে মন দিয়ে রেখেছেন বিদ্রোহীদের। এ সবই হল West Bengal Clinical Establishment Act: 2017-র অভিঘাত। যা গত মার্চ মাসে রাজ্যের বিধানসভায় বিপুল ভোটে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন Indian Medical Association ভেঙে কার্যত দু-টুকরো। কেন্দ্রীয় সংগঠন, রাজ্যের এই আইনের বিরোধী; তারা নানা সংশোধনী চান "চিকিৎসকদের স্বার্থবিরোধী" এই বিলের। রাজ্যের IMA সংগঠন শাসকদলের অনুগামী—এই আইনের সমর্থন করে 'জনমত' গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে। এছাড়াও গজিয়ে উঠেছে Doctors For Democracy, Doctors to Patients, West Bengal Doctors' Forum প্রভৃতি নানা রঙের সংগঠন। এদের সবার বক্তব্য একটাই "চিকিৎসকদের স্বার্থবিরোধী এবং পেশাগত নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক এই আইন প্রত্যাহার/সংশোধন করতে হবে"। শেষোক্ত সংগঠনটি বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছে। তাছাড়া চলছে লাগাতার মিটিং, মিছিল, ধরনা, গণকনভেনশন ইত্যাদি প্রভৃতি। অতিব্যস্ত ডাক্তারবাবুরাও চেম্বারে রোগী বসিয়ে রেখে বা এক নার্সিং হোম থেকে অন্য নার্সিং হোমে উড়ে যাবার সময় দেখা দিয়ে যাচ্ছেন এইসব সমাবেশে। মোদ্দা কথা হল নতুন আইনে চিকিৎসকরা আতঙ্কিত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

চিকিৎসকদের আচরণ কি গণ হিস্টিরিয়া না অ-মূলক? এই নতুন 'দুর্নীতি দমন' আইনের রজ্জুতে তাঁরা কি সর্পভ্রম করছেন? দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসার নামে বেসরকারি হাসপাতালের প্রতারণা এবং লুঠতরাজ সরকারি হাসপাতালের উদাসীনতা ও দুর্ব্যবহার, চিকিৎসক-নার্সিংহোম-ঔষধ কোম্পানির শোষণ চক্র সবকিছুই সাধারণ মানুষ ও উপভোক্তাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। প্রায় প্রতিদিনই মুদ্রিত বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের পাতায় সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার নানা ভয়ংকর ঘটনার কথা প্রকাশ পাচ্ছিল—যদিও তার মধ্যে ভুলভ্রান্তি অজস্র। অক্ষমের ক্রোধ কখনো-সখনো সঙ্ঘবদ্ধতার আশ্রয়ে আছড়ে পড়েছে চিকিৎসক পেটানো বা হাসপাতাল ভাঙচুরের মাধ্যমে।

এইসব ঘটনায় কখনো সরকার বাহাদুর "দারুভূত মুরারীর" মতো বসে থেকেছেন, কখনো রাজনৈতিক নেতারা স্বঘোষিত অভিভাবকরূপে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনাবলি তুঙ্গে পৌঁছাল বাইপাসের অ্যাপোলো হাসপাতালে পথদুর্ঘটনায় আহত যুবকের কুচিকিৎসা, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অর্থ-লোলুপতা এবং ফলে ওই যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যমে তুফান উঠল। আপাত দৃষ্টিতে এ ঘটনার পরেই যেন সরকার নড়েচড়ে বসলেন। বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তাব্যক্তিদের ডেকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তুলোধোনা করলেন, যার ধারাবিবরণী বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হল। সাংবাদিক মহলে হইহই পড়ে গেল কে কত রোমাঞ্চকর, অশ্রুসিক্ত, ভয়াবহ কাহিনি তুলে ধরতে পারেন। প্রতিদিন নানা কুচিকিৎসার কাহিনি মিডিয়ায় প্রকাশ পেল—তার অনেকগুলোতেই ভুলভাবে ডাক্তারদের ভিলেন বানানো হল—কিন্তু জনগণ সেসব গোগ্রাসে গিলল, ও রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকান, চণ্ডীমণ্ডপ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সমস্ত ডাক্তারকুলকে একই আলকাতরার পোঁচে চিহ্নিত করা হতে লাগল। মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির কয়েক দিনের মধ্যেই পেশ হল বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার জন্য ও দুর্নীতি দমন করার জন্য নতুন আইন যার পোশাকি নাম The West Bengal Clinical Establishment (Registration, Regulation & Transparency) Bill, 2017.

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই নতুন আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে সরকার বলেছেন, এর

আগের আইন অর্থাৎ ২০১০ সালে পাশ হওয়া আইনে স্বচ্ছতার অভাব ছিল এবং চিকিৎসায় অবহেলার বিষয়টি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি। সেই জন্য এই নতুন আইনের অবতারণা যা সরকারের মতে এক দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ রোগী-বান্ধব এবং উচ্চ গুণমানের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে বাধ্য করবে। কেননা সরকার মনে করেন যে বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাবসা হলেও আসলে তা একধরনের সেবা এবং বেসরকারি হাসপাতালরা মুনাফা করতেই পারেন কিন্তু সেবার মনোবৃত্তি নিয়েই তাদের মুনাফা করতে হবে।

এবার মূল আইনটিতে আসা যাক। আইনটিতে বলা হয়েছে সরকার বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাবে গভীরভাবে চিন্তিত। যেভাবে এইসব

এই নতুন আইনের অবতারণা যা সরকারের মতে এক দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ রোগী-বান্ধব এবং উচ্চ গুণমানের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে বাধ্য করবে।

চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে রোগী ও তার আত্মীয় পরিজনদের পরিষেবা নিয়ে নানা লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয় তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। সেই জন্য সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র বা Clinical Establishment-এর ক্ষেত্রে এই নতুন আইন লাগু করা হচ্ছে। Clinical Establishment-এর ক্ষেত্রে পড়বে সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ডিসপেন্সারি,পলিক্লিনিক, টিকাদানকেন্দ্র, রোগীদের ভর্তি রাখার জন্য স্যানেটোরিয়াম, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ কেন্দ্র এবং চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চেম্বার।

কোন ধরনের সংস্থাগুলির পরিচালিত হাসপাতালগুলি এর আওতায় আসবে

১. সমস্ত বেসরকারি সংস্থা

২. কর্পোরেট সংস্থা

৩. ট্রাস্ট ও সোসাইটি

৪. লাভজনক ও অলাভজনক সংস্থা

৫. সমবায় সংস্থা

কোন কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই আইনের আওতায় আসবে না

১. সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি, আধা-সরকারি পুরসভা বা পঞ্চায়েত পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

২. সামরিক বাহিনীর হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

৩. ১৯৮৭-র Mental Health Act মোতাবেক মানসিক রোগের চিকিৎসা হয় এমন কেন্দ্র।

আইনটির উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি এইরকম

১. সমস্ত ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টকে এই ধারা মেনে চলতে হবে এবং সেজন্য লাইসেন্স নিতে হবে।

২. আইন মেনে না চললে জরিমানা, জেল এবং হাসপাতাল বন্ধ করে দেবার অধিকার সরকারের থাকবে।

৩. রাস্তায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আহত, অ্যাসিড সংক্রমণের সম্মুখীন এবং ধর্ষণের শিকার কোনো ব্যক্তির টাকা (fee) দেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা না করেই চিকিৎসা করতে হবে। (যদিও হাসপাতাল ভবিষ্যতে সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারে।)

৪. রোগীর মৃতদেহ বিল মেটানো হয়নি বলে আটকে রাখা যাবে না। (যদিও হাসপাতাল ভবিষ্যতে সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারে।)

৫. প্রতি হাসপাতালে জনগণের অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য একটি কেন্দ্র থাকতে হবে।

৬. সব ব্যবস্থাপত্র (Prescription) এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য (Medical Records) বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৭. রোগীর ছুটির সময় সমস্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দিয়ে দিতে হবে।

৮. কোনো ধরনের নির্দিষ্ট চিকিৎসা এবং কোনো অস্ত্রোপচার প্রভৃতির নির্দিষ্ট খরচ আগে থেকেই ঘোষণা করে দিতে হবে।

৯. প্যাকেজ-এর বাইরে কোনো খরচ নেওয়া চলবে না (যেমন গল ব্লাডার, বাইপাস সার্জারি প্রভৃতি) এই ধরনের প্যাকেজ-এর ক্ষেত্রে সমস্ত সম্ভাব্য খরচ আগে থেকে জানিয়ে দিতে হবে এবং কোনোমতে তার থেকে বেশি বিল করা চলবে না।

১০. একই পরীক্ষানিরীক্ষা বারবার করা যাবে না।

১১. প্রতিটি হাসপাতালকে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ও ন্যায্যমূল্যের রোগনির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। রোগীদের হাসপাতাল থেকেই ওষুধ কেনা বা পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য বাধ্য করা চলবে না।

১২. যেসব হাসপাতাল সরকারের কাছ থেকে সস্তায় জমি, করছাড় বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা নিয়েছে তাদের বহির্বিভাগে ২০% এবং অন্দরবিভাগে ১০% রোগীর চিকিৎসা বিনামূল্যে করতে হবে। যারা সরকারি সাহায্য নেয়নি, তাদের ক্ষেত্রেও সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে এই অনুরোধ রাখা হচ্ছে।

১৩. রোগীর পরিজনের সম্মতি ব্যতিরেকে ভেন্টিলেটরে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া যাবে না।

১৪. জরুরি ও প্রাণদায়ী চিকিৎসার ক্ষেত্রে অর্থের অভাবের জন্য রোগী ফেরানো চলবে না।

১৫. HIV/AIDS রোগীদের ক্ষেত্রে কোনো বিমাতৃসুলভ আচরণ করা চলবে না।

নিয়ামক সংস্থার প্রতিষ্ঠা

এই আইনকে প্রয়োগ এবং সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্য সরকার একটি Regulatory Body বা নিয়ামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন

যারা সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে এবং রোগী ও তার পরিজনেরা যেকোনো অভিযোগ নিয়ে দ্রুত সুবিচারের জন্য সেই সংস্থার দ্বারস্থ হতে পারবেন। নিয়ামক সংস্থা বা কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন বিচারপতি শ্রী অসীম কুমার রায়, সহ সভাপতি, একজন বরিষ্ঠ সচিব, সভাপতির অনুপস্থিতিতে যিনি কাজ চালাবেন। কমিশনের বাকি সদস্যরা হলেন সরকারের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা, আইন, সমাজসেবা, অর্থনীতি প্রভৃতি থেকে "মনোনীত" ১১ জন ব্যক্তিত্ব। প্রস্তাবিত কমিশনের সদস্য হয়েছেন ডা. সুকুমার মুখার্জী, ডা. গোপালকৃষ্ণ ঢালি, ডা. অভিজিৎ চৌধুরী, ডা. মাখনলাল সাহা, ডা. মধুসূদন সাহা, ডা. মৈত্রেয়ী ব্যানার্জী। এছাড়া থাকছেন সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, অনুজ শর্মা, প্রবীণ ত্রিপাঠী ও মাধবী দাস। এই কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগ গ্রহণ ও সে বিষয়ে তদন্ত করতে, সে বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে ও শুনানি চালাতে এবং অভিযুক্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানটিকে বা ব্যক্তিকে লাইসেন্স বাতিল, জেল এবং জরিমানা (পঞ্চাশ হাজার

এই কমিশন এত শক্তিশালী যে তাদের রায়ের উপর কোনো দেওয়ানি আদালতে (Civil Court) আরজি বা মোকদ্দমা করা যাবে না।

থেকে পঞ্চাশ লাখ পর্যন্ত) লাগু করতে। এই কমিশন এত শক্তিশালী যে তাদের রায়ের উপর কোনো দেওয়ানি আদালতে (Civil Court) আরজি বা মোকদ্দমা করা যাবে না।

সংশয় এবং বিরোধিতা

সরকারের এই অভূতপূর্ব পদক্ষেপে এতদিন ধরে বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চক্রব্যূহে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত। নিয়ামক কমিশন কেবল ঘোষিত হয়েছে মাত্র। এখনও তার কার্যালয় বা পরিকাঠামো কিছুই তৈরি হয়নি। সংবাদে প্রকাশ মাত্র এক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার অভিযোগপত্র নবান্নে স্বাস্থ্যদপ্তরে জমা পড়েছে যা নিয়ে সেখানকার অধস্তন কর্মচারীরা দিশাহারা।

অপরপক্ষে চিকিৎসকদের একটি বৃহৎ অংশ বিশেষত যেসব চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস অথবা বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন (IMA) উল্লম্বভাবে বিভাজিত হয়ে গেছে। একদিকে সরকারপন্থী চিকিৎসকরা (যাদের অনেকেই অবশ্য চোরাকিল খেয়ে হজম করছেন) আর অন্যদিকে বিদ্রোহী ডাক্তারকুল। রাতারাতি তৈরি হয়েছে বা চাঙ্গা হয়েছে Doctors for Democracy, Doctors for Patient, West Bengal Doctors' Forum প্রভৃতি সংস্থা যারা তাদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা করতে তৎপর। এদের অনেকেই এই বিলের ফলে চিকিৎসক-রোগীর মধুর সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কায় পথে নেমেছেন বলে দাবি করেছেন। ডাক্তারদের কয়েকটি সংগঠন সংঘবদ্ধভাবে এই বিলের সংস্কার চেয়ে আদালতে যাওয়া স্থির করেছেন।

চিকিৎসকদের পেশাগত বক্তব্য ছাড়াও আইনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্ন উঠে এসেছে। যথা—

১. কেন সেই বিখ্যাত প্রবাদবাক্য, Charity begins at home এক্ষেত্রে খাটছে না? সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে যে ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তার বিচার কে করবে? সরকার দাবি করেন রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করেন, যদিও এই দাবির সত্যতা প্রমাণ করা মুশকিল। সেক্ষেত্রে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল কেন এই নিয়ামক সংস্থার নজরদারি থেকে ছাড় পাবে।

২. যারা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা পান, তাদের চিকিৎসাব্যবস্থা কি উচ্চমানের বা দুর্নীতিমুক্ত হবার সম্ভাবনা নেই?

৩. কেন নিয়ামক কমিশনের সমস্ত সদস্যরাই মনোনীত হবেন, নির্বাচিত নন, বর্তমানে কমিশনের অন্তত ৩ জন চিকিৎসক সদস্য নানা বেসরকারি হাসপাতালে Director board আলো করে আছেন। তাঁরা ওই সব হাসপাতালের বিরুদ্ধে কীভাবে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন স্বার্থের সংঘর্ষ (Conflict of Interest) এড়িয়ে।

৪. কমিশনের প্রত্যেক সদস্যই স্ব স্ব পেশায় দারুণ ব্যস্ত। কমিশনের সভা বসবে মাসে একবার কি দু-বার। কীভাবে তারা এই বিপুল পরিমাণ অভিযোগের সুবিচার করবেন?

৫. আইনে বলা হয়েছে অবহেলা সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ কমিশনে এলে তদন্তে ফয়সালা হবার আগেই কমিশন ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জরিমানার নির্দেশ দিতে পারেন সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। কোনো মাসের ২৯ তারিখে যদি কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়, তবে একদিনের মধ্যে কোনো তদন্ত বা শুনানি ছাড়াই ওই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পরে যদি স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে ওই জরিমানার টাকা কীভাবে ফেরত পাওয়া যাবে বা আদৌ ফেরত পাওয়া যাবে কি না সে প্রসঙ্গে আইন নিশ্চুপ। কেবল শিবঠাকুরের আপন দেশেই এমন আইন সম্ভব।

৬. কমিশনে কোনো হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বা ব্যক্তিচিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে তা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির অর্থেই কাগজে বিজ্ঞাপিত করা হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন, পরে যদি দেখা যায় অভিযোগটি মিথ্যা তাহলে ওই বিজ্ঞাপনের খরচ কীভাবে ওই কমিশন ফেরত দেবে। ওই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের যে সামাজিক ক্ষতি হল সেই ক্ষতিপূরণ কীভাবে সম্ভব হবে?

৭. সবচেয়ে বড়ো অসংগতি হচ্ছে, কেন Regulatory কমিশনের সিদ্ধান্ত কোনো দেওয়ানি আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এটা তো দেশের সাধারণ আইন এবং বিচারব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কোনো সরকারি আইন বলে ন্যায় বিচারের অধিকার থেকে কাউকে এভাবে বঞ্চিত করা যায় নাকি? সরকার বাহাদুর সম্ভবত জানেন মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) বিরোধী এই ধারা আদালতে খারিজ হয়ে যাবে। তখন হয়তো সরকারের তরফে বলা হবে যে

তাঁরা জনগণের পাশেই দাঁড়াতে চেয়েছিলেন যা স্বার্থান্বেষী মামলাবাজ চিকিৎসকরা বানচাল করে দিলেন।

৮. ৩ এবং ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে অর্থের অভাবে বা অর্থ না দিতে পারার জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করা চলবে না এবং মৃতদেহ আটকে রাখা চলবে না। তার সঙ্গে একটি উপধারা যোগ করা হয়েছে, "যদি বেসরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত হয় যে অনাদায়ী টাকা তারা রুগী বা তার পরিবারের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে," এই কথার মানে কী! তাহলে তো বলতে হয় প্রয়াত সঞ্জয় রায়ের ক্ষেত্রে অ্যাপেলো হাসপাতাল তার স্ত্রীর ফিক্‌জড্ ডিপোজিটের কাগজপত্র আটকে রেখে বা গয়না বন্ধক দিতে চাপাচাপি করে সঠিক কাজই করেছিল, কেননা তারা গ্যারান্টি চাইছিল যে অনাদায়ী টাকা তারা উদ্ধার করতে পারবে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে ২০১০ সালের আইনে ছিল যে অনাদায়ী বিল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠালে যদি তারা তা সঠিক মনে করেন তাহলে সরকারি তহবিল থেকেই তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। এখানে তার কোনো উল্লেখ নেই।

৯. ভুল চিকিৎসা ও অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা

আইনে বলা হয়েছে যদি এই নিয়ামক সংস্থা মনে করেন, চিকিৎসায় অবহেলা (Medical Negligence) বা ভুল চিকিৎসা করা হয়েছে (Medical malpractice) অথবা অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে তাঁরা শাস্তি দেবেন। মজার কথা হল, আমাদের দেশে বা রাজ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার কয়েকটি বিষয়, প্রসব, সাপে কাটা বা পেট খারাপ এই ধরনের সাধারণ কয়েকটি বিষয় ছাড়া প্রায় কোনো জটিল রোগ বা অস্ত্রোপচারের কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম (Standard Protocol) নেই, যা উন্নত দেশগুলির প্রায় প্রতিটিতে আছে। ফলে কোনটা সুচিকিৎসা আর কোনটা ভুলচিকিৎসা তা প্রমাণ হবে কী করে?

১০. একই সঙ্গে সেবা আর মুনাফা!

নতুন আইন বলছে স্বাস্থ্য হল বাণিজ্যের মোড়কে আসলে মানবসেবা। এটা কি চূড়ান্ত স্ববিরোধিতা নয়? আমাদের দেশসহ সারা দুনিয়ায় চিকিৎসা ব্যাবসা হল সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান বাণিজ্য যার বৃদ্ধির হার প্রায় ১৫ শতাংশর কাছাকাছি। সেই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য এবং পণ্য পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে ঢুকে কীভাবে "সেবা" য় পরিণত হল?

উপসংহার

নয়া আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলি প্রশংসারই যোগ্য, কিন্তু সন্দেহ —তা অন্য নানা সরকারি নীতির মতোই হয়তো পর্বতের মূষিক প্রসব করবে। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর যে এই 'যুগান্তকারী আইন' খসড়া এবং বলবৎ করার ক্ষেত্রে মুখ্য চিকিৎসা অধিকর্তা (DHS) বা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার (DME) মতো সর্বোচ্চ স্তরের সরকারি আধিকারিকদেরও সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে স্বাস্থ্য সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব সহ তিন জন আমলা প্রস্তাবটি দাখিল করেন এবং শাসকদলেও বিশেষ কোনো আলোচনা ব্যতিরেকেই তা আইনে পরিণত হয়।

বেসরকারি হাসপাতালে কী ধরনের রোগীরা ভিড় জমান? TIFR (Tata Institute of Fundamental Research)-এর একটি গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছিল যে প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ রোগী সেখানে যেতে বাধ্য হন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে না পেরে, রোগনির্ণয় পরীক্ষার লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে, জীবনদায়ী অস্ত্রোপচারে অস্বাভাবিক দেরির কারণে এবং অবহেলা ও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়ে। তাছাড়া এর পেছনে সক্রিয় থাকে রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট অতি শক্তিশালী দালালচক্র। যদিও এটা অস্বীকার করা উচিত হবে না যে, বর্তমান সরকার সবার জন্য নিঃশুল্ক পরিষেবা ঘোষণা করার ফলে, ওষুধের সরবরাহ অনেক বাড়ার ফলে এবং নানা পরীক্ষানিরীক্ষার আধুনিক যন্ত্রপাতি সরকারি হাসপাতালে আসার ফলে অনেক বেশি সংখ্যক মধ্যবিত্ত বা গরিব মানুষ সরকারি হাসপাতালে আসছেন। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় পরিকাঠামো এখনও অনেক দুর্বল। ফলত প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে তাদের জমি বাড়ি হাল বলদ, সোনাদানা বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ করে, পারিবারিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগী নিয়ে শামিল হতে হয়। নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির ক্ষেত্রে এটি মহা বিপর্যয় হয়ে দাঁড়ায়। এই বিপর্যয়ের অভিঘাতে ভারতবর্ষের প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রতি বছর দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যায়।

প্রকৃত সমাধান হল সরকারি পরিকাঠামোর উন্নতি, নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবাকে জনগণের অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে মেনে নেওয়া। এমন পরিষেবার ব্যবস্থা করা যাকে বলে সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা বা Universal Health Care.

আমাদের মনে হয় এই নতুন আইন বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে "জব্দ" করার ক্ষেত্রে এবং সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছতাসহ সুচিকিৎসা দেবার ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র এক সমাধানের ত্রুটিপূর্ণ প্রচেষ্টা। প্রকৃত সমাধান হল সরকারি পরিকাঠামোর উন্নতি, নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবাকে জনগণের অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে মেনে নেওয়া। এমন পরিষেবার ব্যবস্থা করা যাকে বলে সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা বা Universal Health Care. আগ্রহী পাঠকেরা জানেন ২০১০-১১ সালে ডা. শ্রীনাথ রেড্ডী কমিটি বা HLEG-র সুপারিশ অনুযায়ী সামান্য ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধিতেই এমন পরিষেবা দেশের সমস্ত নাগরিককে দেওয়া সম্ভব। তবেই বেসরকারি হাসপাতালের অনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হতে পারে। এছাড়া মানুষের "ভালো করার" অন্য কোনো চোখধাঁধানো শর্টকাট রাস্তা নেই। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, এম.বি.বি.এস এমডি, কেন্দ্রীয় সরকারে অধীনে স্বশাসিত এক সংস্থার হাসপাতালে বরিষ্ঠ চিকিৎসক।

চিকিৎসকের মুষ্টিযোগ এবং পশ্চিমবাংলার ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য

আক্রান্ত চিকিৎসক

মেডিসিনের মান্য জার্নাল *ল্যানসেট* পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল, ২০১৭-তে একটি রিপোর্ট ছাপা হল—Rising violence against health workers in India। সে রিপোর্টের শুরুতেই বলা হচ্ছে—ভারতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাথে যুক্ত কর্মীরা একটি ভাঙনের মুখে (breaking point) এসে পৌঁছেছে। কর্মস্থলে যেকোনো সময় সবসময়েই দৈহিকভাবে আক্রান্ত হবার উৎকণ্ঠা এঁদের। এই লেখাতে ২০১৬-র দিল্লির একটি টারসিয়ারি কেয়ার (tertiary care) হাসপাতালে চালানো এক সমীক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। সে সমীক্ষা অনুযায়ী ১২ মাসে শতকরা ৪০ জন রেসিডেন্ট চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে হিংসার মুখোমুখি হয়েছেন।

দেশীয় জার্নাল *National Medical Journal of India*-র ২৫ জুন, ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে "Workplace violence against resident doctors in a tertiary care hospital in Delhi"। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বা IMA জানাচ্ছে, এদেশের শতকরা ৭৫ জন চিকিৎসক তাদের সারাজীবনে কোনো-না-কোনো সময়ে মৌখিক বা দৈহিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে।

অধুনা IMA-র জাতীয় সভাপতি কে কে আগরওয়াল এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "জুনিয়র ডাক্তাররা সবচেয়ে বেশি হিংসাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হয়। ইমার্জেন্সি রুমে এঁরাই সর্বপ্রথম রোগীদের চিকিৎসা করছেন এমনটাই রোগীরা দেখেন। অথচ জুনিয়র ডাক্তাররা অধিকাংশ সময়েই রোগীদের নানারকমের যথাযথ উত্তর দিতে পারঙ্গম নয়। রোগীর আত্মীয়স্বজনেরাও এদেরকে গুরুত্ব দেবার মতো বা ধর্তব্যে আনার মতো অভিজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে গণ্য করে না। ফলে এক সংঘাতের মুহূর্ত (conflict situation) তৈরি হয়।"

আমাদের পরিবেশে কর্মস্থলে হিংসা খানিকটা আকস্মিকভাবে এলেও আমেরিকার সংস্কৃতিতে এ বিষয়টি খুব অভিনব নয়। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬-তে *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল*-এ একটি রিভিউ আর্টিকল ছাপা হয়েছিল "Workplace Violence against Health Care Workers in the United States" শিরোনামে। সেখানে বন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের শিহরিত করে বই কী। সে আর্টিকল-এ মন্তব্য করা হল—"Health care workplace violence is an underreported, ubiquitous, and persistent problem that has been tolerated, and largely ignored." গুলি-বন্দুক বাদ দিলে আমাদের পরিস্থিতির সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

গণরোষের কারণ

বছর তিনেক আগে *ল্যানসেট*-এ একটি ছোটো রিপোর্ট বেরিয়েছিল "Violence against doctors in India" শিরোনামে (১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)। বাওয়াসকর (Bawaskar) সে আলোচনায় জোর দিয়েছিলেন ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের ওপরে। তাঁর বয়ানে ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের অবনতির কারণগুলো এরকম:[১]

অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা, হাসপাতালে ভর্তি হবার পরে রোগীকে দেখতে আসার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা, আগাম টাকা নেওয়া, এমনকী মৃত্যুর পরে টাকা না মেটানো পর্যন্ত মৃতদেহ আটকে রাখা। এখানে যে সমস্যাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো সবই পুরো বা আংশিক সত্যি। বরঞ্চ এখানে যেটা বলা হয়নি তা হল আন্তর্জাতিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ক্ষেত্রে ভারত এ মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার—১০ বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি। এখানে গরিব রোগীদের ওপরে কম পয়সায় ট্রায়াল চালানো যায় এবং ট্রায়ালে রোগীর মৃত্যু হলে ডাক্তার ও ট্রায়াল চালনাকারী সংস্থাকে প্রায় জবাবদিহি করতে হয় না বললেই চলে। অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রায় অনুপস্থিত।

নতুন আইন

এরকম বিভিন্ন জমে ওঠা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে অসহায়, নিরাশ্রয়, উদ্‌বিগ্ন ও চিকিৎসাপ্রার্থী রোগীদের রক্ষাকবচ দেবার জন্য এবং অন্যদিকে, চিকিৎসা ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ীকে লাগাম পড়ানোর জন্য (ধরে নেওয়া যেতে পারে) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা ১৭ মার্চ, ২০১৭-তে The West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Act, 2017 পাস করেছে। নমুনা হিসেবে একটা ধারার কথা উল্লেখ করে সাময়িকভাবে প্রসঙ্গান্তরে যাব। ৩-এর জে ধারায় (3-j) যা বলা হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত বাংলা তর্জমায় দাঁড়ায়—ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাসিড আক্রান্ত, ধর্ষণের শিকার কিংবা হঠাৎ যেকোনো দুর্ঘটনায় পড়া মানুষ নার্সিং হোম, প্রাইভেট হাসপাতাল (এই ধারা অনুযায়ী যত প্রতাপশালীই হোক না কেন সে হাসপাতাল) বা অন্য বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাবে। এবং এ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওই হাসপাতালগুলোর অর্থের কথা মাথায় রাখলে চলবে না, তখন চিকিৎসাই প্রধান বিবেচ্য।[২] আবার একই ধারাতে সংযোজিত হয়েছে

এরকম শর্তের কথা—যথাসময়ে পরিস্থিতি অনুকূল হলে এ খরচ মিটিয়ে দিতে হবে এ শর্তে চিকিৎসা হচ্ছে। এর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা কী হতে পারে তা পাঠকদের বোধের জন্যই তোলা থাক। কিন্তু জনমানসে একই ধারার শুধু প্রথমাংশটি যদি আলোচনার মুখ্য ফোকাস হয়ে ওঠে তাহলে টাকা উশুলের প্রসঙ্গ পেছনে চলে যাবে, জনমানসের উপরিতলে প্রতিভাত হতে থাকবে সংকটের বিহ্বলতায় অর্থ কোনো অনাসৃষ্টি করবে না। এই আইন নিয়ে আমরা বারবার ফিরে আসব, কিন্তু তার আগে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে নেওয়া যাক।

রোগী-চিকিৎসকের সম্পর্কের অবনতি নিয়ে ভাবনা ও ঘটনা

২৪ মার্চ, ২০১৭ ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের ব্লগে খুব গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেখতে পাচ্ছি।[৩] এখানে তিনটি মনোযোগ দেবার মতো কথা বলা হল—প্রথমত, ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে যে তীব্র অবনমন স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে তা সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, যেমন ডাক্তারদের তরফে তেমন রোগীদের তরফে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং জনমোহিনী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত সরকার একে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিচ্ছে না। তৃতীয়ত, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ সামান্য অর্থ প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কার্যত বেহাল করে তুলেছে।

যেকোনো মানুষ বুঝবেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা primary care অতি দুর্বল জায়গায় এবং নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে বলে সামান্য জটিল পরিস্থিতিতে রোগীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রায় সামান্য সমস্যাতেই উচ্চতর কেন্দ্রে, যেমন সাবডিভিশনাল হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল, শেষে কলকাতায়, রেফারড হয়। উচ্চতর সরকারি ব্যবস্থায় হয়রানি ও বেড না পাবার ফলে ঘটিবাটি বেচেও মানুষ বেসরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হন। ফলে একদিকে সরকারি উচ্চতর হাসপাতালে চাপ এত বাড়ে যে ঔৎকর্ষ বজায় রাখা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালের রোগী বাড়ে, বাড়ে মুনাফা। সরকারি ব্যবস্থায় যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার নেই, ফলে একজন ডাক্তারের পক্ষে—সে জেনারাল ফিজিশিয়ানই হোক বা সুপার-স্পেশালিস্ট—এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। গড়ে রোগী পিছু দু-এক মিনিট করে সময় দেওয়াও কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর শিকার হয় ডাক্তার এবং রোগী উভয়েই। রোগীর মনে ধারণা তৈরি হয়ে যে সে উপযুক্ত নজর ও গুরুত্ব পাচ্ছে না, একটি কেস নম্বর ছাড়া এরকম স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সে আর কিছু নয়। ডাক্তারের ভাবমূর্তি তৈরি হয় মানুষ-বিচ্যুত, রোগী সম্পর্কে উদাসীন এবং উদ্ধত (অনেক ক্ষেত্রেই সত্যিও বটে) এক না-মানুষ সত্তা। জীবন-মরণকে ঘিরে গড়ে ওঠা এক অতি সংবেদনশীল, নিতান্ত আবশ্যক, ঐতিহাসিক সম্পর্কের করুণ পরিণতির আলেখ্য রচনা হতে থাকে।

এখানে আরেকটি গূহ্যতর সত্যকে বুঝতে হবে। সামাজিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক সুরক্ষা বা চাকরির সম্ভাবনাহীনতা যখন প্রাধান্যকারী জায়গায় থাকে তখন একদিকে জনমোহিনী রাজনীতির সামান্য অনুদানও জনসমাজ খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চায়, আবার অন্যদিকে শূন্যদিশা জনসমাজের প্রবল ক্ষোভ এবং অপূর্ণতা mob violence বা গণহিংসার চেহারা নিয়ে আছড়ে পড়ে। স্মরণ করতে পারি সত্যজিতের "জনঅরণ্য", মৃণালের একাধিক ছবি, শ্যাম বেনেগাল বা গোবিন্দ নিহালনি-র বিভিন্ন চলচ্চিত্রের কথা। আমরা দেখেছি নিষ্ফলা ক্রোধ এবং আক্রোশ কীভাবে জনসমাজে প্রতিবিম্বিত হয়। এখানে ডাক্তারকে স্থাপন করলে দেখব, সে একজন সফল, ঈর্ষণীয়ভাবে স্বচ্ছল এবং ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। এর বিপরীতে রোগীটি আর্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সম্বলহীন এবং ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে থাকা একজন ব্যক্তি মানুষ। একদিক থেকে দেখলে এ দ্বন্দ্ব ক্ষমতা এবং ক্ষমতাহীনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্বও বটে। কিন্তু ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও একজন আমলা বা পুলিশ বা শিল্পপতি বা রাজনৈতিক নেতার সাথে ডাক্তারের পার্থক্য হল একজন আমলা বা পুলিশ বা রাজনৈতিক নেতা সরাসরি ক্ষমতাকেন্দ্রের অংশীদার, এর উপাদান। একজন শিল্পপতি বহুলাংশে এদের নিয়ন্ত্রক। কিন্তু একজন ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী ক্ষমতাকেন্দ্রের সাথে যুক্ত নয়। এবং এ অর্থে "ক্ষমতাচ্যুত", ফলে এরা জনরোষের ক্ষেত্রে একটি soft target যাকে সহজেই আক্রমণ করা যায়, নিজেদের প্রবল ক্ষোভকে সহজে উগড়ে দেওয়া যায় এদের ওপরে। একটি সহজ উদাহরণ হল একজন জনপ্রতিনিধি এয়ারলাইন্সের একজন অফিসারকে আক্ষরিক অর্থে পিটিয়েও দিব্যি মেজাজে ঘুরে বেড়াতে পারেন। কোনো আইন নেই একে শাস্তি দেবার বা সাধারণ মানুষের সাধ্যি নেই একে ছোঁবার। কোনো Parliamentary Act তৈরি হয় না একে স্পর্শ করার জন্য। বিপরীত চিত্রটি কলকাতায় ঘটে। করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী বৃদ্ধ ডা. আগরওয়ালকে গণপ্রহারে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে গণপ্রহারে নবীন ডাক্তারের মৃত্যুও ঘটে। এ নিয়ে অতি-সাম্প্রতিক অতীতে মুম্বই ও দিল্লিতে ডাক্তারদের বড়োসড়ো সমাবেশ ও ধর্মঘট হয়েছে।

আরেকটু তলিয়ে দেখলে চোখে পড়বে, বয়স এবং লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এলে চিকিৎসা পাবে এটা সবার কাছে এতই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং এতই স্বাভাবিকভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদাবোধের মধ্যে পড়ে যে এর কোনো ব্যত্যয় হলে আমরা আহত বোধ করি, উত্তেজিত হয়ে পড়ি। অথচ কলেজ বা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে অসফল হলে এমন কোনো বোধ জন্ম নেয় না। ওটাকে মেধার ঘাটতি বলে মেনে নিই। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অন্তর্লীন বোধের সাথে অন্য বিষয়গুলোর মূলগত পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্য আমাদের কাছে একটি মূল্যবোধ বলে মনে হয়, এখনও জনমানসে সেভাবেই প্রতিভাত হয়। চিকিৎসক বা ডাক্তারকে গণ্য করা হয় এই মূল্যবোধের ধারক বা ব্যক্তরূপ হিসেবে। কিন্তু বিশেষ করে বিগত শতকের ৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে value বা মূল্যবোধ সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত হতে শুরু করল বাজারের মূল্যমানে, যাকে বিভিন্ন স্তরের মূল্য দিয়ে ক্রয় করা যায়। এই রূপান্তরের এক সুদীর্ঘ কাহিনি রয়েছে যা এখানে আলোচনা

করা সম্ভব নয়, বর্তমান পরিসরে খুব প্রয়োজনীয়ও নয়। শুধু এটুকু প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে এখনও অবধি সবচেয়ে কমবয়সে নোবেল প্রাইজ পাওয়া অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড হায়েক ১৯৬০ সালে তাঁর The Constitution of Liberty গ্রন্থে প্রথম হেলথ সার্ভিস বা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মুক্ত বাজারের হাতে তুলে দেবার সুপারিশ করেন। (The Constitution of Liberty, পৃষ্ঠা ২৯৭-৩০০)। মূল্যবোধ যখন মূল্যমানে পরিণত হয় তখন রোগী হয়ে ওঠে একজন economic man তথা consumer বা ভোক্তা। হাসপাতাল বা নার্সিং হোম এর বিক্রয়কেন্দ্র আর চিকিৎসকেরা এর provider বা সরবরাহকারী।

কিন্তু চিকিৎসা-প্রত্যাশী মানুষ এবং economic man তথা consumer বা ভোক্তার মধ্যেকার প্রভেদ চোখে পড়বে ডা. শ্রীনাথ রেড্ডির তুলে ধরা এ কাহিনিটি জানলে। রেড্ডি জানাচ্ছেন রাজেশ বলে একজন ব্যক্তি যথেষ্ট কম মজুরিতে দিল্লির একটি জামা-কাপড়ের দোকানে চাকরি করত। তার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক বা myocardial infarction হয়। তাকে দ্রুত একটি প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানানো হয় চিকিৎসার খরচ পড়বে প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা। টাকা দিতে অপারগ রোগীর পরিবার রোগীকে শেষ অব্দি AIIMS-এ নিয়ে গেলে রোগীর সেরে ওঠা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ হয় ৬,৫০০ টাকারও কম। রেড্ডি একটি ছোট্ট মন্তব্য করছেন এই অভাবী রোগীর পরিপ্রেক্ষিতে, “এঁকে চিকিৎসা দেওয়া আটকে থাকে কেননা সিস্টেম সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর ব্যবস্থা করেনি।”[৪] এ লেখাতেই রেড্ডি জানাচ্ছেন, ভারতের বেসরকারি চিকিৎসার বিপুল খরচ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাসিক আয়ের ২৫-৪০%) মেটাতে গিয়ে প্রায় ৬.৫ কোটি ভারতবাসী প্রতিবছর দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। একে বলা হয় “মেডিক্যাল পভার্টি ট্র্যাপ”। আমাদের কাছে দু-টি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসে। সরকারি পরিষেবা আর মুনাফা-উৎপাদক বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যেকার খরচের বিরাট ফারাক আছে, আর universal health coverage বা সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা না থাকা অভাবী এবং অসহায় মানুষের ক্ষেত্রে এই ফারাক অতি ভয়াবহ পরিণাম তৈরি করে।

নতুন আইন—ফিরে দেখা

এখানে প্রশ্ন উঠবে শুধুমাত্র বেসরকারি হাসপাতালের ধার্য করা চার্জের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা ঠিক করে এ সমস্যার সমাধান হবে কি? কিংবা শুধুমাত্র বেসরকারি হাসপাতালের লাগাম টেনে চিকিৎসার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি রোধ করা সম্ভব কি না? পশ্চিমবাংলায় যে নতুন ক্লিনিক্যাল অ্যাক্ট হল তাতে হেলথ সিস্টেম বা স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য ব্যবস্থাপনার কিঞ্চিৎ উন্নতি সম্ভব, সেটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যপরিষেবাকে ঘিরে মূল সমস্যাগুলো অধরাই থাকল। রোগীর নামে বেসরকারি হাসপাতালের ওপর হম্বিতম্বি করা হল, কিন্তু সেই রোগীর রোগপ্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা পাবার কিছু সুরাহা হল না। অপরদিকে তার সামনে একটি শত্রু দাঁড় করিয়ে দেওয়া গেল—সরকারি বুলিতে তার নাম হল লোভী বেসরকারি হাসপাতাল।

সমস্যা হল, মুখ্যমন্ত্রী যতই বলুন বেসরকারি হাসপাতাল যে অতিরিক্ত লাভ করছে সেটাই খারাপ, ডাক্তারদের অধিকাংশই ভালো, মানুষের কাছে এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল আর তার ডাক্তার সমার্থক। জনসমক্ষে আসা হাসপাতালের একমাত্র মুখ হল ডাক্তারের মুখ। কাজে কাজেই অতি-লাভ যেই করুক না কেন, বারংবার ডাক্তাররা আক্রান্ত হবে, হাসপাতালে ভাঙচুর হবে—এ ঘটনার বাস্তব ভিত্তি থেকেই গেল।

অন্যদিকে, সরকারি হাসপাতালগুলো ক্লিনিক্যাল অ্যাক্টের আওতার বাইরে থাকবে কেন? সমগ্র বিষয়টি দেখাশোনার জন্য যে নিয়ামক কমিশন তৈরি হয়েছে সে কমিশনের সমস্ত সদস্যই কেন মনোনীত হবে, কেন নির্বাচিত হবে না? সর্বোপরি, বর্তমান কমিশনের অন্তত তিনজন সদস্য যেখানে নানা বেসরকারি হাসপাতালের ডিরেক্টর’স বোর্ডে আছেন সেক্ষেত্রে সেসব হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ক্ষেত্রে কীভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন? আন্তর্জাতিকভাবে রিসার্চ থেকে যেকোনো বিষয়ে “স্বার্থ সংঘাত” বা conflict of interest ডিক্লেয়ার করা বাধ্যতামূলক এবং এথিক্সের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে “স্বার্থ সংঘাত” বা conflict of interest-কে কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া যাবে তা নিয়ে কোনো উত্তর নেই। এপ্রিল ২০১৭-র *অনীক* পত্রিকায় প্রকাশিত সিদ্ধার্থ গুপ্তের প্রবন্ধে এ ব্যাপারে কিছু বাস্তব টেকনিক্যাল মন্তব্য পাঠযোগ্য।

সকলের জন্য স্বাস্থ্য—একটি আন্তর্জাতিক পশ্চাদপসরণ

সাময়িকভাবে পশ্চিমবঙ্গের এই আইনটি মাথায় রেখে, তার প্রেক্ষিত হিসেবে, আমরা একটি ঐতিহাসিক বিবর্তনকে নজরে আনতে পারি। ১৯৭৮ সালে তদানীন্তন রাশিয়ার কাজাখিস্থানের আলমা-আটা শহরে ৬-১২ সেপ্টেম্বর বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন হয়েছিল। পৃথিবীর ১৩৪টি দেশ, ৯০টি আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বহুসংখ্যক অ-সরকারি সংগঠন এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের শ্লোগান ছিল “২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য”। একে সুনিশ্চিত করার জন্য comprehensive primary health care বা সুসংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা-র ওপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সম্মেলনের সনদপত্রে এমন প্রস্তাবও ছিল যে যুদ্ধখাতে ব্যয় কমিয়ে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্যবান নাগরিক দীর্ঘমেয়াদিভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটায়, দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু দৃষ্টিকোণ যদি বদলে যায় তাহলে? এক নতুন যাত্রাপথ জন্ম নেয়—১৯৭৮ সালের আলমা আটা সম্মেলনের “২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য” এবং “সংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা”-র বোধ ২০১৭-তে এসে অতিমাত্রায় বিক্রয়যোগ্য “স্বাস্থ্য পরিষেবা”-র পণ্য বাজারে রূপান্তরিত হয়। বিক্রয়যোগ্য “স্বাস্থ্য পরিষেবা”-র পণ্য বাজারে রূপান্তর ঘটে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নীতি রচনায়, সরকার পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং অতিবৃহৎ বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ও পাঁচতারা ঝাঁ-চকচকে প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর মধ্য দিয়ে। এরকম এক

পরিস্থিতিতে চটজলদি মুনাফা করা একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়ে পড়ে। মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিস্মরণে চলে যায়। স্বাস্থ্যের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকে না, স্বাস্থ্যপরিষেবার খরচ মেটানোর জন্য ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানিগুলোর দৌরাত্ম্য বাড়ে। স্বাস্থ্যে বিনিয়োগকে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা হবে এরকম অবস্থায়। স্বাস্থ্যের চাইতে যুদ্ধাস্ত্র কেনা বা উপগ্রহ দিয়ে নজরদারি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। চিকিৎসাহীন আর স্বাস্থ্যপরিষেবার সুযোগ-বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে জনসমাজের একটা বড়ো অংশ।

নতুন আইন ও এদেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্র

পশ্চিমবাংলায় যে নতুন ক্লিনিক্যাল অ্যাক্ট হল তাতে এ বিষয়গুলো নিয়ে নিরুত্তর থেকে, সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরুত্তর থেকে, চালু দামি বৃহৎ বেসরকারি হাসপাতালের স্থিতাবস্থাকে গ্রহণ করে কার্যত ডাক্তারদের সফট টার্গেট হিসেবে বলির পাঁঠা করে দেওয়া হল। অথচ তাত্ত্বিকভাবে ২০১৭-র জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিও এর থেকে ভিন্ন অবস্থানে আছে। সেখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে প্রায় ৬.৫ কোটি মানুষের দরিদ্র হয়ে যাবার কথা। স্বীকার করা হয়েছে স্বাস্থ্যখাতে GDP-র অতিসামান্য ১.৫% ব্যয়কে বাড়িয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে ২.৫% করার কথা (যদিও বিশেষজ্ঞরা বলেন ৪%-এর কমে ভারতের মতো দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে কিছু করা যায় না। থাইল্যান্ডের মতো দেশে এর পরিমাণ ৪%-এর বেশি।)। স্বীকার করা হয়েছে ২০২০-র মধ্যে রাজ্যগুলোর যা মোট বাজেট তার ৮%-এর বেশি স্বাস্থ্যখাতে খরচ করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—"from selective care to assured comprehensive care with linkages to referral hospitals." বাংলায় বললে, বেছে বেছে চিকিৎসা নয়, সবার জন্য সামগ্রিক রোগনিরাময় ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা চাই, আর রেফার করার মতো উচ্চস্তরের হাসপাতালের সুযোগ চাই। ঘোষণা করা হয়েছে জনস্বাস্থ্যের সুযোগসুবিধে ২০২৫-এর মধ্যে ৫০% বাড়ানো হবে। এর কার্যকর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তামিলনাড়ুতে MBBS পাশ করার পরে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩ বছর কাজ করা বাধ্যতামূলক, নাহলে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের পরীক্ষায় বসা যাবে না।

কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ তেমন বড়ো 'বাজার' নয়। হয়তো সেকারণেই, বিপরীত টান বেশি শক্তিশালী, এ-সন্দেহ থেকেই যায়। ১৯৭০ সালের পর থেকে ভারতের মেডিক্যাল শিক্ষায় ক্রমাগত স্পেশালাইজেশনের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে জেনারাল ফিজিসিয়ানের গুরুত্ব ক্রমশ কমেছে। ("Addressing underlying causes of violence against doctors in India", *Lancet*, May 20, 2017) সর্দি-কাশির মতো অসুখেও স্পেশালিস্টকে দেখানো সামাজিক রীতি ও প্রবণতা হয়ে উঠেছে। স্পেশালিস্টদের সবচেয়ে লাভজনক জায়গা এই দামি প্রাইভেট হাসপাতালগুলো। এমনকী আমেরিকাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় primary care physician নিয়ে হাহাকার রব উঠেছে। ২০২০ সালের মধ্যে আমেরিকাতে ১০০,০০০ ফিজিসিয়ানের ঘাটতি পড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি পড়বে জেনারাল ফিজিসিয়ানদের। ("The Evolving Primary Care Physician", *NEJM*, May 17, 2012)

কেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা?

একের পর এক গবেষণাপত্র দেখিয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসুরক্ষার ওপর জোর দিলে রোগের সম্ভাবনা কমানোও যায়, মৃত্যুহার কমে, চিকিৎসার খরচ কমে, অন্যদিকে রোগীর সন্তুষ্টি বাড়ে। (Barbara Starfield et al, "Contributions of Primary Care in Health Systems and Health", *Milbank Quarterly* 83.3 (2005): 457-502)। একেবারে হালে নিউ ইংল্যান্ড জার্নালের একটি রিভিউ আর্টিকেলে জেনারেল ফিজিশিয়ানদের ঘাটতি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার 'দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক' হয়ে ওঠা নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে: আমরা বুঝি প্রতিরোধের চেয়ে আরোগ্যকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যতের সন্ততি কিংবা পরিচ্ছন্নতার চাইতে আমাদের হাড়ের সুরক্ষা ও ত্বকের চাকচিক্য আধিকতর কাম্য হয়ে উঠেছে, ত্বক কুঁচকে যাওয়া বা একটা তিলের গুরুত্ব যেন বেশি হয়ে উঠেছে আমাদের হাঁটাচলা, চোখের দৃষ্টি কিংবা কানে শুনতে পাবার চেয়ে, অর্থাৎ আমাদের সক্ষম থাকার চেয়ে (Louise Aronson, "A Tale of Two Doctors—Structural Inequalities and the Culture of Medicine", NEJM, June 15, 2017).

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখে নেওয়া ভালো। ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে AIIMS-এর মতো প্রতিষ্ঠানের ৫৪% ছাত্র পাড়ি দিয়েছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে ("High-end physician migration from India, Bulletin of the World Health Organization 86 (2008): 40-45)। ২০০৬-এর তথ্যানুযায়ী, ভারতের মোট মেডিক্যাল স্নাতকের (৫৯২,২১৫) ১০.১% বা ৫৯,০৯৫ জন বিদেশে চলে গিয়েছে (Fitzhugh Mullan, "Doctors For the World: Indian Physician Emigration," *Health Affairs* 25.3 (2006): 380-393)। প্রায় ৬০,০০০ ডাক্তার যারা বিদেশে পসার করেছে তাদের ৪০, ৮৩৮ জন আছে আমেরিকায় (আমেরিকার মোট চিকিৎসকের ৪.৯%), ১৫,০৯৩ জন ইংল্যান্ড-এ (মোট চিকিৎসকের ১০.৯%), ২,১৪৩ জন অস্ট্রেলিয়াতে (মোট চিকিৎসকের ৪.০%) এবং ১,৪৪৯ জন কানাডাতে (মোট চিকিৎসকের ২.১%)। (Fitzhugh Mullan, "The Metrics of the Physician Brain Drain," *NEJM* October 27, 2005: 1810-1817) এ সমস্ত চিকিৎসক কী ভূমিকা পালন করেন? সব দেশের তথ্য না পাওয়া গেলেও আমেরিকার পরিসংখ্যান বলে আমেরিকার গ্রামাঞ্চলের দিকে যেসব CAH (Critical Access Hospital) আছে সেখানকার প্রতি ৪ জন চিকিৎসকের ১ জন (২৫%) হচ্ছে আমেরিকান নয় এমন, এদের মধ্যে ৬১% হচ্ছে ভারতীয় ("The role of international medical graduates in America's small critical access hospitals," *Journal of Rural Health* 20.1 (2004): 52-58)।

এ পরিস্থিতিতে আমেরিকার অবস্থা দেখা যাক। ডোনাল্ড ট্রাম্প এসে ওবামার Affordable Care Act-কে তুলে দিয়েছেন। পরিণতিতে "health insurers have announced that they will not offer individual market coverage in 2018"। ("Turmoil in the Individual Insurance Market—Where It Came From and How to Fix It", *New England Journal of Medicine* June 22, 2017) যে ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানিগুলো ইন্সিয়োরেন্স করাবে তারা ২০১৮-তে প্রিমিয়ামের পরিমাণ ২০% বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কোম্পানিগুলো ফাঁকা হাতে ঘুরে বেড়াবে না। "মেডিক্যাল পভার্টি ট্র্যাপ" থেকে বাঁচানোর জন্য ১৩০ কোটির দেশে মেডিক্যাল মার্কেটের বুকে পা ফেলবে আশা করা যায়। এজন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার রাষ্ট্রিক স্তরে দ্রুতগতিতে হয়ে যাচ্ছে। ছোটো নার্সিং হোম বা হাসপাতাল হয় উঠে যাবে বা জুড়ে যাবে বৃহৎ হাসপাতালের জালে। সেখানে স্পেশালিস্টরা আছে। ভারতের প্রভাবশালী চিকিৎসকদের একাংশ এর মধ্যেই ইন্সিয়োরেন্সের পক্ষে সজোর সওয়াল শুরু করে দিয়েছে। কেবলমাত্র একটাই অসুবিধে হল ভারতবর্ষ এত বেশি বড়ো ও heterogeneous (অসমসত্ত্ব) যে সব পরিকল্পনা যেমনটা ভাবা হবে তেমনটা হুবহু এগোবে না। এর সাথে আছে একটি মোটের ওপরে শক্তিশালী নাগরিক সমাজ, চিকিৎসকেরাও যার অংশ। ফলে প্রতিরোধ তৈরি হবে। শেষ অবধি কী দাঁড়াবে এখুনি বলা মুশকিল। তবে প্রবণতা সেদিকে। আমরা ব্রিটিশ NHS বা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের কথা ভাবতে পারি। কীভাবে মানুষ সেখানে পরিষেবা পান আমাদের তলিয়ে দেখা দরকার।

এ দেশ তো বাউল-ফকিরেরও। তাদের কোনো ইন্সিয়োরেন্স নেই। মৃত্যুর পরে আত্মীয়-পরিজন ছাড়া দেখার জন্য আর কোনো ব্যবস্থাও নেই। এদেরই কেউ হয়তো গাইতে গাইতে যাবে—কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়! ক্লিনিক্যাল এসটাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টও কি এরকম একটি রঙ্গ? আরও অনেক রঙ্গের দিকে যাত্রা?

টিকা ও তথ্যসূত্র

১. "The main reasons for patients' relatives to become violent are unnecessary investigations, delay in attending patient, request of advance payments, or withholding a deceased body until settlement of final billing. Ultimately the medical trade now involved in this noble profession has resulted in doctors, patients, and relatives' unrest."

২. " . . . that every clinical establishment shall provide necessary medical treatment to victims of road traffic accident, persons suffering from sudden calamities, acid attack victims and rape victims irrespective of their ability to bear the treatment cost at the relevant time: Provided that the clinical establishment shall have the right to recover the cost from the service recipients or his representatives in due course of time."

৩. The incidents of violence and the response of doctors' organisations must both be seen in the social and political context of contemporary developments in India. Doctors – and indeed patients too – have been let down both by poor leadership of the profession and by populist governments that have invested pitifully small sums on publicly funded health care systems.

৪. " . . . to comfort him is constrained by a system that does not provide for universal health coverage." (K. Srinath Reddy, "India's Aspirations for Universal Health Coverage", *New England Journal of Medicine* 373.1 (2015): 1-5)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য, এমবিবিএস, স্বাধীন গবেষক ও প্রবন্ধকার

একক মাত্রা

Advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

জনস্বার্থে মোদীর নিদান—জেনেরিক প্রেসক্রিপশন কতটা মানুষের কাজে লাগবে?

২০০২ সালে এম সি আই-এর পরামর্শ, ২০০৫-এ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ডাক্তারদের প্রতি সরকারি নির্দেশ, ২০১২ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ডাক্তারদের ওপর কড়া নজরদারি . . . এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী ডাক্তারদের জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন। জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার কতটা সুফল পাওয়া যাবে—লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

২০১৭-র ১৭ এপ্রিল সুরাটের এক দাতব্য হাসপাতাল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী জানান—ডাক্তারদের এবার থেকে ওষুধের জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন করতে হবে রোগীরা যাতে দামি ব্র্যান্ড কিনতে বাধ্য না হন। প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে ব্লক ক্যাপিটাল অক্ষরে, পড়তে যাতে অসুবিধা না হয়।

২১ এপ্রিল মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এম সি আই)-এর সেক্রেটারি এক নির্দেশ পাঠালেন, সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল বা ডিন, সমস্ত হাসপাতালের ডিরেক্টর, সমস্ত রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্য-সচিব, সমস্ত রাজ্যের ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস এবং ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন প্রমুখদের। বলা হল, সমস্ত চিকিৎসককে ওষুধ লেখার সময় জেনেরিক নামে স্পষ্ট অক্ষরে (ভালো হয় বড়ো অক্ষর অর্থাৎ capital letters-এ) লিখতে হবে। তাঁদের নিশ্চিত হতে হবে প্রেসক্রিপশন ও ওষুধের ব্যবহার যেন যুক্তিসঙ্গত হয়। রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা এই নিয়ম না মানলে তাঁদের বিরুদ্ধে স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল ব্যবস্থা নেবে বলা হল।

মোদীর ঘোষণা এবং এম সি আই-এর নির্দেশের পর পক্ষে বিপক্ষে তুমুল আলোচনা চলছে। আসুন না দেখি, সাধারণ মানুষের কতটা কাজে লাগবে জেনেরিক প্রেসক্রিপশন।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা জেনেরিক নাম ব্যবহারের পক্ষে। আসলে জেনেরিক নাম নয়, শুদ্ধ কথাটা হল আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম (International Non-proprietary Name বা INN)।

আমরা আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্যবহারের পক্ষে কেননা

☞ আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামই ওষুধবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপত্রে-পড়াশুনায় ব্যবহৃত হয়।

☞ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জার্নালগুলো ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশনাগুলোতেও কেবল আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্যবহার করা হয় ।

☞ বাজারে একাধিক ওষুধের মিশ্রণে তৈরি প্রচুর ফর্মুলেশন (Fixed Dose Combinations) পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানিগুলো বেশি সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন ও বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

☞ ওষুধের আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম দেখে সেটা কোন ধরনের ওষুধ বোঝা সহজ হয়। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই বিভ্রান্তিও হয় না আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্যবহারে।

☞ অনেক সময় ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া থেকে কোনো রোগ, যেমন চামড়ার i¨k, হতে পারে, এবং তা মারাত্মকও হতে পারে। ব্যাবসায়িক নাম অসংখ্য, ফলে কোন ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে ও তার জন্য কোন পার্শ্বক্রিয়া হয়েছে, সেটা চিকিৎসক বুঝেই উঠতে পারেন না।

☞ দেখা যায় আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামের ওষুধগুলোর দাম সাধারণভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে অনেকটা কম দামি।

☞ কেবল আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদের অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হয়, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হয় না।

☞ আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্যবহৃত হলে জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা তৈরি করা সহজ হয়।

☞ আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম চললে ব্র্যান্ডের প্রচার-প্রসার করতে হয় না, খরচ কমে, ওষুধের দামও কমে।

☞ ওষুধের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসাকর্মীদের ধোঁয়াশা কাটে।

জেনে রাখুন ওষুধের আসলে তিনটে নাম:

প্রথম নামটি পুরো রাসায়নিক নাম, যা কাজে লাগে রসায়নবিদদের।

দ্বিতীয় নামটি জেনেরিক নাম, এই নাম ব্যবহার করা হয় ওষুধ-বিজ্ঞান সহ চিকিৎসাবিদ্যার অন্যান্য শাখার আলোচনায়। জেনেরিক নামের আসল অর্থ গোত্র নাম, জেনেরিক নাম বলতে ওষুধের ক্ষেত্রে কিন্তু ওষুধের একটি গোত্র বা গোষ্ঠীর (এক ধরনের কিছু ওষুধের) নাম না বুঝিয়ে একটি ওষুধের নাম বোঝানো হয়। তাই জেনেরিক নামের বদলে বলা উচিত আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম (International Nonproprietary Name) ।

তৃতীয় নামটি হল ব্র্যান্ড নাম বা বাণিজ্যিক নাম। একটি ওষুধের বাণিজ্যিক নাম অবশ্য একটি নয়। একই ওষুধকে আলাদা আলাদা ওষুধ-কোম্পানি আলাদা আলাদা নাম দেয়।

কীভাবে জেনেরিক নাম বা আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম এল?

আগে একই ওষুধ ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচিত ছিল ভিন্ন ভিন্ন নামে। বছর ৫০ আগে নামে সমতা আনার প্রয়াস শুরু হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওষুধের আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ঠিক করে। বেশির ভাগ দেশই এখন আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্যবহার করে। ব্যতিক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যেমন আমরা দেখেছি প্যারাসিটামলকে সে দেশে ডাকা হয় এসিটামিনোফেন নামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নামগুলি (USA National Names) অবশ্য আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামে পরিবর্তিত হচ্ছে। ব্রিটেনে অনুমোদিত নামগুলো (British Approved Names—BAN)-ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ঠিক করা হয় কেমন করে?

আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ঠিক করার সময় তিনটি বিষয় দেখা হয়:

১. উচ্চারণে ও বানানে যাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, হাতের লেখাতেও যাতে অসুবিধা না হয়।

২. চলতি অব্যাবসায়িক নাম বা বাণিজ্যিক নামগুলোর সঙ্গে যাতে এ নাম গুলিয়ে না যায়।

৩. নাম থেকে যাতে একই ধরনের বিভিন্ন ওষুধের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্দাজ করা যায়।

দেখুন কীভাবে অব্যাবসায়িক নাম থেকে ওষুধগুলিকে চেনা যায়:

➤ ডায়াজিপাম, নাইট্রাজিপাম, ফ্লুরাজিপাম—এই প্রশান্তিকারক ওষুধগুলো সব বেঞ্জোডায়াজেপিন।

➤ প্রোপ্রানোলল, এটেনেলল, মেটোপ্রোলল—'ওলল' দিয়ে শেষ হওয়া ওষুধগুলো রক্তচাপ কমানোর ওষুধ, যাদের বলা হয় এড্রেনোরিসেপ্টর ব্লকার বা বিটা-ব্লকার।

➤ এনালাপ্রিল, রেমিপ্রিল, লিসিনোপ্রিল—'প্রিল' দিয়ে শেষ হওয়া প্রেশারের ওষুধগুলো এসিই-ইনহিবিটর, আরেক ধরনের রক্তচাপ কমানোর ওষুধ।

➤ 'ফ্লক্সাসিন' দিয়ে শেষ হওয়া নরফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, গ্যাটিফ্লক্সাসিন, ইত্যাদি কুইনোলন জীবাণুনাশক।

কীভাবে আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম লেখা হবে তারও বিভিন্ন নিয়ম ঠিক করা আছে বিভিন্ন দেশে। আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ব্র্যান্ড নামের ঠিক নীচে লিখতেই হয়। কোনো কোনো দেশে আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ছাপা হয় যে সাইজের অক্ষরে ব্র্যান্ড নাম ছাপা হয়েছে অন্তত তার অর্ধেক সাইজের অক্ষরে। কোনো কোনো দেশে আবার আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নাম ছাপতে হয় ব্র্যান্ড নামের চেয়ে বড়ো অক্ষরে। কোনো দেশ আবার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নামের ব্যবহার তুলেই দিয়েছে।

আমরা ব্র্যান্ড নামের বিপক্ষে কেননা সেগুলি বিভ্রান্তিকর

আমাদের দেশে উৎপাদিত বস্তুর পেটেন্ট স্বীকৃত নয়, উৎপাদন-পদ্ধতির পেটেন্ট স্বীকৃত। এই কারণে কোনো ওষুধের কোনো মালিক নেই, মালিকানা কেবল ওষুধ তৈরির পদ্ধতির। একই ওষুধ একাধিক কোম্পানি আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে তৈরি করতে পারে। ওষুধের কোনো ব্র্যান্ড নাম এক অর্থে কোনো একটি কোম্পানির সম্পত্তি। কিন্তু সেখানেও কথা আছে—বেশির ভাগ ব্র্যান্ড নামই কিন্তু নথিভুক্ত করা নয়, কেননা আমাদের দেশে নাম নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া খুব জটিল ও তাতে দীর্ঘ সময় লাগে। যে ব্র্যান্ড নামগুলি নথিভুক্ত নয়, যে কেউই সে নাম ব্যবহার করতে পারে। নথিভুক্ত ব্র্যান্ড নামগুলিও আবার অন্য শ্রেণির পণ্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন 'মারুতি' গাড়ির জন্য নথিভুক্ত নাম, কোনো ওষুধের ব্র্যান্ড নাম কিন্তু মারুতি হতেই পারে। এর ফলে বিভ্রান্তির শেষ নেই। কী রকম বিভ্রান্তি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

১. একই ব্যান্ড নামে পাওয়া যেতে পারে আলাদা শ্রেণির ওষুধ—'Lona'এই নামে ট্রাইটন হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড ক্লোনাজিপাম তৈরি করে, ক্লোনাজিপাম মৃগীরোগে, উদ্‌বেগে ব্যবহার করা হয়। আবার 'Lona' নামে ডাবর তৈরি করে উচ্চরক্তচাপের রোগীদের জন্য কম সোডিয়াম-যুক্ত লবণ।

২. কিছু ব্র্যান্ড নাম আবার এতটাই এক রকম যে গণ্ডগোল হয়ে যায়--

❖ A to Z এগ্রোমেডের মাল্টিভিটামিন, AZ-1 কোপ্রানের জীবাণুনাশক এজিথ্রোমাইসিন, AZ কিওর কুইক ফার্মার কৃমির ওষুধ এলবেন্ডাজোল।

❖ Celib ইউনিকেম ল্যাবের ব্যথার ওষুধ সেলেকক্সিব, Celin গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লিনের ভিটামিন সি।

❖ Eltocin ইপকা ল্যাবের জীবাণুনাশক এরিথ্রোমাইসিন, El-

troxin গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লিনের লিভোথাইরক্সিন যা হাইপোথাইরয়েড রোগে ব্যবহার করা হয়।

❖ Fasigyn ফাইজারের আমাশার ওষুধ টিনিডাজোল, Fasizym ইনফারের এনজাইম প্রিপারেশন।

❖ Glyred নোভার্টিসের গ্লাইক্লাজাইড, Glyrep এমকিওর ফার্মার মেটফরমিন, দুটিই অবশ্য ডায়াবেটিসের দুই শ্রেণির ওষুধ।

❖ Orfiz নোভার্টিস ফার্মার ORS, Orfix অর্কিডের জীবাণুনাশক সিফিক্সিম।

❖ Pronim ইউনিকেম লিমিটেডের ব্যথার ওষুধ, Pronil পিআইএল-এর বিষাদের ওষুধ ফ্লুওক্সেটিন।

❖ Tobitil রেনব্যাক্সির ব্যথার ওষুধ টেনোক্সিকাম, Tobitol পিসিআই-এর যক্ষ্মার ওষুধ ইথামবুটল।

❖ Trip ফাইজারের বিষাদের ওষুধ নরট্রিপ্টিলিন, Triz ইন্ডোকো রেমিডিজের অ্যালার্জির ওষুধ সেট্রিজিন।

❖ Vizole এম এল ল্যাবসের কৃমির ওষুধ লিভামিজোল, Vinzole ভিন্টেজ ল্যাবসের পেপ্টিক আলসারের ওষুধ ওমপেরাজোল।

৩. একই কোম্পানি আবার নিজেদের উৎপাদিত আলাদা ওষুধের এতটাই একরকম নাম দেয় যে গুলিয়ে যায়—

✠ প্যারেন্টাল কোম্পানি তার দুই জীবাণুনাশক এমোক্সিসিলিন ও রক্সিথ্রোমাইসিনের নাম দিয়েছে যথাক্রমে PD-Mox ও PD-Rox।

✠ পিআইএল-এর দুই মনোরোগের ওষুধ ক্লোমিপ্রামিন ও ক্লোরপ্রোমাজিনের নাম যথাক্রমে Clomine ও Clozine।

✠ Taxim এবং Taxim-O যথাক্রমে এলকেমের দুই জীবাণুনাশক সেফোট্যাক্সিম ও সেফিক্সিম।

বুঝতেই পারছেন ব্র্যান্ড নাম থেকে কী পরিমাণ চিকিৎসা-বিভ্রাট হতে পারে!

আমরা ব্র্যান্ড নামের বিরুদ্ধে কেননা ব্র্যান্ড ওষুধের দাম জেনেরিকের থেকে অনেক বেশি

কোম্পানি নিজের ব্র্যান্ডকে পরিচিত করানোর জন্য প্রচার করে, সেই প্রচারের খরচ তোলে রোগীর পকেট কেটে ওষুধের দামে। তাই একই ওষুধ এক-এক কোম্পানির ব্র্যান্ডে এক-এক রকম দাম। যে প্যারাসিটামলের ৫০০ মিগ্রা-র ট্যাবলেট অ্যালবার্ট ডেভিড Parazine নামে বিক্রি করে এক-একটা ১৫ পয়সা দামে, ফার্মা সিন্থ ফর্মুলেশন্স লিমিটেড Paranova নামে তা বিক্রি করে এক-একটা ৫ টাকা ৯০ পয়সায়। প্রথম ব্র্যান্ডটার তুলনায় পরের ব্র্যান্ডটার দাম প্রায় ৪০ গুণ!

জেনেরিক নামের ওষুধের তুলনায় ব্র্যান্ড নামের ওষুধ গুণবত্তায় ভালো—এমনটা নয়

অনেকে মনে করেন কোম্পানি যখন ব্র্যান্ড নামকে পরিচিত করানোর জন্য এত পয়সা খরচ করেছে তখন সে ওষুধের গুণবত্তার সঙ্গে আপোশ করবে না। ডাক্তাররাও অনেকে এমনটা বিশ্বাস করেন, তাই দেখি জেনেরিক নামের বিরুদ্ধে ও ব্র্যান্ড নামের স্বপক্ষে জনমত তৈরি করতে তাঁরা নেমে পড়েন। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় বহুল পরিচিত অনেক ওষুধ কোম্পানি ও ওষুধের ব্র্যান্ড মুনাফার লক্ষ্যে গুণবত্তায় আপোশ করে। গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা যেসব ক্লিনিক বা হাসপাতাল চালান সেগুলির এবং সরকারি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলির অভিজ্ঞতা থেকে জোরের সঙ্গেই বলা যায় জেনেরিক নামের ওষুধ ও তার নানান ব্র্যান্ডের কার্যক্ষমতায় কোনো ফারাক নেই।

আরেকটা ব্যাপার অনেকেই খেয়াল করেন না। ওষুধের মোড়কের পিছনে 'manufactured at' আর 'marketed by' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা কোম্পানি। এমনটা সম্ভব হয় আমাদের দেশের ওষুধ ও প্রসাধনী আইনে 'loan licence' -এর প্রথা থাকার ফলে। ওষুধ নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে লোন লাইসেন্স নিয়ে এক কোম্পানি অন্যের কোম্পানিতে ওষুধ তৈরি করাতে পারে। ফলে নামি কোম্পানির দামি ব্র্যান্ড বলে আমরা যে ওষুধ কিনি, তার অধিকাংশই এমন অনামি কোম্পানিতে তৈরি, যারা জেনেরিক ওষুধ তৈরি করে।

কিন্তু সমস্যা আছে বিস্তর!
জেনেরিক নামের ওষুধ বাজারে পাওয়াই যায় না

মমতা-মোদী ডাক্তারদের নির্দেশ দিচ্ছেন জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার জন্য। কিন্তু জেনেরিক নামে আজকাল ওষুধ উৎপাদিতই হয় না। বড়ো বড়ো ওষুধ কোম্পানিগুলোর জেনেরিক ডিভিশনও আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদিত ওষুধে ব্র্যান্ড নাম দেয়, এদের বলা হয় 'ব্যান্ডেড জেনেরিক্স'। জেনেরিক নামের প্রেসক্রিপশনে দোকানি তাঁর ইচ্ছামতো ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ দেন। স্বভাবতই যে ব্র্যান্ডের ওষুধে তাঁর লাভ বেশি সেটাই তাঁর পছন্দের ওষুধ হয়।

স্পষ্ট অক্ষরে প্রেসক্রিপশন লেখা হোক এমনটা আমরাও চাই

অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাঁরা এমন দুর্বোধ্য হাতের লেখায় প্রেসক্রিপশন লেখেন যে বিশেষ ওষুধের দোকানি ছাড়া অন্য কেউ তা পড়তে পারেন না। ডাক্তাররা আবার স্পষ্ট অক্ষরে প্রেসক্রিপশন না লেখার পেছনে সময়াভাবকে কারণ দেখান। ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে এম সি আই স্পষ্ট অক্ষরে, সম্ভব হলে ব্লক ক্যাপিটালে ওষুধ লেখার কথা বলার পর থেকে, পশ্চিমবঙ্গের দুটি জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ এবং সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালের কিছু ডাক্তার ব্লক ক্যাপিটালে ওষুধের নাম লেখা শুরু করেন। দেখা গেছে তাঁদের অতিরিক্ত অনেকটা সময় লাগছে এমন নয়। বরং ওষুধ ডিস্পেন্সিং-এ ভুল অনেক কমে গেছে।

সরকার যদি মানুষের কল্যাণ চায়

তাহলে ডাক্তারদের জেনেরিক প্রেসক্রিপশন করতে বাধ্য করার পাশাপাশি ওষুধ কোম্পানিগুলিকে বাধ্য করুক ব্র্যান্ড নামে ওষুধ

উৎপাদন বন্ধ করতে। ব্র্যান্ড নাম না থাকলে ওষুধের দাম এমনিতেই অনেক কমে যাবে।

সরকার যদি চায় ডাক্তাররা যুক্তিপূর্ণ প্রেসক্রিপশন লিখুন, ওষুধের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার করুন, তাহলে—

- সমস্ত অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদন বন্ধে কোম্পানিগুলিকে বাধ্য করুক।
- রোগী কোনো সমস্যা নিয়ে এলে, কোন কোন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে, কোন ওষুধ লেখা হবে, কখন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হবে, তা নির্দিষ্ট থাকুক প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি বা standard treatment guidelines-এ।
- ওষুধ যাঁরা লেখেন তাঁদের ওষুধ সম্পর্কিত বিশদ তথ্য জানাতে থাকুক drug formulary।

এই পদক্ষেপগুলি ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আর এম সি আই-এর নির্দেশে মানুষের কোনো লাভ হবে না।

শেষ কথা

ওষুধ লেখেন কে? ডাক্তার। কিছু কিছু প্রাথমিক ওষুধ, যেমন জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল বা ডায়ারিয়ায় নুন-গ্লুকোজ ইত্যাদির মিশ্রণ ওআরএস, স্বাস্থ্যকর্মীরাই লেখেন, কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার তাঁরা ডাক্তারদের কাছ থেকেই শেখেন। অল্প কয়েক ধরনের ওষুধ হল ‘ওভার দ্য কাউন্টার’ (OTC), যেগুলো রোগী নিজেই কিনে খেতে পারেন। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই ওষুধ লেখেন ডাক্তার, অন্তত দেশের আইনমতে, তাই হবার কথা। সরকার ডাক্তারদের জেনেরিক নামে ওষুধ লিখতে বলছেন। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, জেনেরিক নামে লিখতে বললেও, ব্র্যান্ড নাম লিখতে মানা তো নেই। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার। জেনেরিক নামে, বা আরও সঠিকভাবে বললে, আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামে, ওষুধ মানুষের হাতে পৌঁছোক, সরকার নীতি হিসেবে এমনটাই চাইছেন।

তাহলে ডাক্তারদের ওপর চাপ দেবার দরকার কী? বাজারে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ না রাখলেই তো ল্যাটা চুকে যায়! এখনকার যা সরকারি বিধান, তাতে ডাক্তার লিখবেন আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামে, আর ওষুধের দোকানদার তার ইচ্ছে মাফিক (বা মুনাফার পরিমাণ মাফিক)

> **সত্যিই যদি রোগীর ভালো করতে হয় তো দোকানদারদের আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামের ওষুধ রাখতে হবে, সরকারকে সেই ওষুধ তৈরি করিয়ে বাজারে যথেষ্ট জোগান বজায় রাখতে হবে**

একটা ‘ব্র্যান্ডেড জেনেরিক’ নামক সোনার পাথরবাটি বা হাঁসজারু রোগীকে দেবেন, তাতে রোগীর লাভ কী? সত্যিই যদি রোগীর ভালো করতে হয় তো দোকানদারদের আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামের ওষুধ রাখতে হবে, সরকারকে সেই ওষুধ তৈরি করিয়ে বাজারে যথেষ্ট জোগান বজায় রাখতে হবে; এরকম চালিয়াতি করে খালি ডাক্তারদের নামে একখানা ফরমান ঝেড়ে দিলেই চলবে না।

সরকার ঠিক কী চাইছেন? সস্তা পপুলারিটি? স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের খরচ যে দিনে দিনে কমানো হচ্ছে, ডাক্তারদের নন্দ ঘোষ বানিয়ে সেদিক থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখা? তা যদি না হয়, তাহলে সরকার তো আন্তর্জাতিক অব্যাবসায়িক নামে ওষুধ চালানোর চেষ্টার জন্য প্রথমেই অজস্র ডাক্তারদের কোটি কোটি প্রেসক্রিপশনের ওপর নজরদারি করার অতি কঠিন কাজটি হাতে নেবার আগে, কয়েক হাজার মাত্র ওষুধ কোম্পানি যাতে ব্র্যান্ডনামে ওষুধের বদলে কেবল অব্যাবসায়িক নামে ওষুধ বাজারে ছাড়ে, সেটাই দেখতেন। আর বাজারে ব্র্যান্ডনামে ওষুধ না থাকলে কোনো ডাক্তার নিশ্চয় সে নামে ওষুধ লিখতেন না।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ এমবিবিএস। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী এবং *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদক।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

ডায়াবেটিসের জটিলতা এড়াতে নিয়মিত নজরদারি দরকার

অন্য সাধারণ রোগগুলোর থেকে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদি অসংক্রামক রোগগুলো একটু আলাদা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগগুলোর উপসর্গ বোঝা যায় না বা অনেক দেরি করে প্রকাশ পায়। ততক্ষণে শরীরের বিভিন্ন অ ঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অনেকটাই ক্ষতির শিকার হয়ে যায়। মূলত হার্ট, কিডনি, চোখ, স্নায়ু, অগ্ন্যাশয়, ধমনি ও রক্তজালিকা এর প্রধান শিকার হলেও শরীরের এমন কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই রোগের কবল থেকে রেহাই পায়। কারণ যেকোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই রক্ত চলাচলের জন্য ধমনি-রক্তজালিকা ও স্নায়ু বর্তমান। ডায়াবেটিসের জটিলতা নিয়ে লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**, সহায়তায় **ডা. মৃণ্ময়**।

চেঙ্গাইলে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ক্লিনিকে এক্স-রে ঘরের দরজার উপর এক মহিলার ছবি দেখতে পাবেন। মনীষা দত্ত, সম্পর্কে আমার মাসি, হলদিয়া সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে হিন্দির শিক্ষিকা, মারা যান ২০০০ সালে। মাসি বিয়ে করেননি, মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত অর্থের এক অংশে আমাদের এক্স-রে ঘরটা বানানো হয়েছিল। মাত্র ৬০-৬১ বছর বয়সে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তার বছর পাঁচেক আগে দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থেকে।

মাসির ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ৩৫ বছর বয়সে। সে সময়ে ৪০ বছর বয়সের কমে ডায়াবেটিস ধরা পড়লে ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হত। অর্থের অভাব ছিল না, তিনি নিয়মিতই ওষুধ নিতেন, ডাক্তার দেখাতেন। তবুও চোখ খারাপ হল, কিডনি খারাপ হল, খারাপ যখন ধরা পড়ল, তখন করার খুব একটা কিছু ছিল না। আসলে সে সময়ে ডায়াবেটিসের জটিলতাগুলো নিয়ে সাধারণ মানুষ বা রোগীদের সচেতনতা তো দূরের কথা, অধিকাংশ ডাক্তারই সচেতন ছিলেন না।

ডায়াবেটিসের জটিলতা নিয়ে আলোচনা করার আগে রোগটা সম্বন্ধে জ্ঞান একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন তৈরি হওয়া কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে, অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন বেরোনো কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে অথবা ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা কমে গেলে যে রোগ হয় তার নাম ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ।

ইনসুলিন রক্ত থেকে গ্লুকোজকে শরীরের কোষে ঢুকতে সাহায্য করে, সেখানে গ্লুকোজ জ্বালিয়ে শক্তি তৈরি হয়। এছাড়া লিভারের কোষে বিভিন্ন ভাঙাগড়ার কাজেও সাহায্য করে ইনসুলিন। ডায়াবেটিস মেলিটাস-এ রক্তে গ্লুকোজ থাকা সত্ত্বেও শরীরের কোষগুলো তাকে কাজে লাগাতে পারে না, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ রয়েছে

১. টাইপ ১ ডায়াবেটিস: এই অবস্থায় ইনসুলিন তৈরি খুব কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, তাই ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

২. টাইপ ২ ডায়াবেটিস: এঁদের ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা অল্প কমে বা একদমই কমে না। কিন্তু ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।

৩. অপুষ্টিজনিত ডায়াবেটিস: আমাদের মতো গরিব দেশের মানুষদের খাবারে প্রোটিন প্রায় থাকেই না; প্রায় শূন্যই বলা চলে। তাঁরা বেশির ভাগটা শ্বেতসার জাতীয় খাবার খান। ফলে ইনসুলিন উৎপাদনকারী অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলো ক্রমশ খারাপ হতে হতে শেষ অবধি নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের চিকিৎসায় তাই ইনসুলিন দিতে হয়।

৪. অন্য অসুখের কারণে ডায়াবেটিস: অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয়, আর সেটাই আমাদের দেহে শর্করা বা সুগার কোথায় কতটা থাকবে সেটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু শর্করার আরও কিছু নিয়ন্ত্রক আছে, যেমন কর্টিকোস্টেরয়েড বা গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন। সেই সব নিয়ন্ত্রক পদার্থ কমলে বা বাড়লে রক্তে শর্করা বাড়ে বা কমে, ডায়াবেটিস হতে পারে। এগুলো নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা এখন করব না।

রক্তরসে গ্লুকোজের মাত্রা (মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে)

	খালি পেটে	**গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর**
স্বাভাবিক	১১৫-র কম	১৪০-এর কম
বিকৃত গ্লুকোজ টলারেন্স	১১৫ থেকে ১৪০	১৪০ থেকে ২০০
ডায়াবেটিস	১২৫-এর বেশি	২০০-র বেশি

ডায়াবেটিস একটা ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান জটিলতা দেখা দেয়—

- ➢ করোনারি ধমনির রোগ, যা থেকে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক।
- ➢ মস্তিষ্কের ধমনির রোগ, যা থেকে স্ট্রোক হতে পারে।
- ➢ রেটিনোপ্যাথি যা অন্ধত্ব ডেকে আনতে পারে।
- ➢ নিউরোপ্যাথি, যার জন্য অঙ্গচ্ছেদও করতে হতে পারে।

মুশকিল হল এইসব জটিলতার প্রথম অবস্থায় কোনো উপসর্গ থাকে না, জটিলতা অনেকটা বাড়ার পর রোগী কষ্ট অনুভব করেন। তাই জটিলতা এড়ানো বা কম রাখার একমাত্র উপায় হল ডাক্তারি নজরদারিতে থাকা আর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে কড়া বাঁধনে বেঁধে রাখা।

ডায়াবেটিস হার্ট আর রক্তনালীর জটিলতা

বড়ো ও মাঝারি মাপের ধমনি: ডায়াবেটিসে আমাদের কোষে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে। এই মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ থেকে তৈরি পদার্থ কোষের ভেতর বা বাইরে প্রোটিন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই অন্তিম পদার্থটি মূল সমস্যা ঘটায়। প্রথমত, এটি ধমনির দেওয়ালের গায়ের মাংসপেশির বিভাজন ঘটায়, মাংসপেশির স্তর পুরু হয়ে যায় এবং ভিতরের আবরণী কোষের নানা পরিবর্তন ঘটায়। দ্বিতীয়ত, এটি ধমনির দেওয়ালে চর্বি জমা হতে সাহায্য করে। দুইয়ের ফলে ধমনির মধ্যে রক্ত প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে সংক্রমণ সহজে সারে না ও শরীরের দূরবর্তী অংশে যেমন পা বা হাতে ঘা হয়।

ছোটো ধমনি ও রক্তজালিকা: ছোটো ধমনির ক্ষেত্রে দেওয়ালের আবরণী কোষের নিচের স্তর পুরু হয়ে যায়। ফলে রক্তপ্রবাহ বাধা পায়। পুরু হলেও কিন্তু এগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে ও এগুলির ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। রক্তজালিকাগুলির পর্দার আবরণী কোষ-স্তরের বাইরের পেরিসাইট নামক কোষ নষ্ট হতে থাকে। ফলে রক্তজালিকাগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

হৃদ্‌পিণ্ড: ডায়াবেটিসে হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনিতে চর্বি জমে সরু হয়ে যায় । ফলে হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত চলাচল কমে যায়। যার ফলে ইশ্চেমিক হার্টের রোগ ও হার্ট অ্যাটাক এর সম্ভাবনা বাড়ে।

এগুলোকে এড়ানোর উপায় হল—

- ☞ ধূমপান ছেড়ে দেওয়া।
- ☞ জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে আর প্রয়োজনে ওষুধ খেয়ে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমানো।
- ☞ রক্ত পরীক্ষা করে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা দেখা, বেশি থাকলে খাবার-দাবার নিয়ন্ত্রণ করা। কারুকে কারুকে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর ওষুধ খেতেও হয়, সাধারণত কোনো স্ট্যাটিন (যেমন অ্যাটরভাস্ট্যাটিন)। যেসব ডায়াবেটিস রোগীর বয়স ৪০ বছরের বেশি তাঁদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা যদি স্বাভাবিকও থাকে, তাহলেও তাঁদের স্ট্যাটিন দিলে ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমে বলে দেখা যায়।
- ☞ যাঁদের হার্টের বা ধমনির অসুখ আছে বা হওয়ার ঝুঁকি বেশি, তাঁদের অ্যাস্পিরিন দেওয়া উচিত।

ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ

ডায়াবেটিসের দীর্ঘস্থায়ী জটিলতাগুলো রক্তনালীর ওপর বেশি ব্লাড সুগারের কারণে। টাইপ ১ এবং টাইপ ২—দুই ধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের ওপরই গবেষণা করে দেখা গেছে—স্বাভাবিক মাত্রার কাছাকাছি ব্লাড সুগারের মাত্রা রাখা গেলে জটিলতা কম হয়।

ব্লাড সুগার কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখলে তা বড্ড বেশি কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার ভয় থাকে। সকালে খালি পেটে এবং দুপুরে ও রাতে খাওয়ার আগে ব্লাড সুগার ৮০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম/ ডেসিলিটার রাখাটা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু ব্লাড সুগার কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখলে তা বড্ড বেশি কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার ভয় থাকে। সকালে খালি পেটে এবং দুপুরে ও রাতে খাওয়ার আগে ব্লাড সুগার ৮০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম/ ডেসিলিটার রাখাটা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রক্তে শর্করা কতটা নিয়ন্ত্রণে আছে তা দেখার জন্য গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন (HbA1C) নামক আরেকটা পরীক্ষা করা যায়। পরীক্ষাটা অবশ্য খরচের। এর থেকে বোঝা যায় আগের ১-৩ মাসে ব্লাড সুগারের মাত্রা কেমন ছিল। HbA1C-র মাত্রা ৭% বা তার নীচে রাখতে হয়। HbA1C-র মাত্রা ৭% মানে হল গড়ে ব্লাড সুগারের মাত্রা ১৫০ মিলিগ্রাম/ ডেসিলিটার। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অবশ্য HbA1C-র লক্ষ্যমাত্রা একটু বেশি রাখা হয় হাইপোগ্লাইসিমিয়ার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য। দেখা গেছে HbA1C-র মাত্রা একটু কমানো গেলে জটিলতা হওয়ার ঝুঁকি বেশ খানিকটা কমে।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইনসুলিন লাগে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসে অনেক সময় জীবনযাত্রার পরিমার্জন (খাবার-দাবার নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক ব্যায়াম) করেই ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বাকিদের মুখে খাবার ওষুধ দিতে হয়। মুখে খাবার ওষুধ কিছু ক্ষেত্রে কাজ না দিলে ইনসুলিন লাগে।

ডায়াবেটিসে চোখের রোগ

ডায়াবেটিসের অন্যতম জটিলতা হল রেটিনার রোগ—ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি—রেটিনার রক্তনালীগুলোর রোগ। ডায়াবেটিসে চোখের নানা ধরনের ও সুনির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় চোখ, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে চোখের পর্দা বা রেটিনা, পরীক্ষা করার সময় অনেকের ডায়াবেটিস ধরা পড়ে।

- ⮝ রেটিনার রক্তজালিকা পুরু হয়ে যায়।
- ⮝ রেটিনার রক্তজালিকার ভেদ্যতা বাড়ে—ফলে রেটিনাতে ইডিমা হয় অর্থাৎ জল জমে।

⅄ রেটিনার রক্তজালিকার আবরণী কোষ-স্তরের বাইরে পেরিসাইট কোষ নষ্ট হওয়ার ফলে রক্তজালিকাগুলির পর্দা দুর্বল হয়ে যায়। যার ফলে রক্তজালিকাগুলির পর্দার কিছু কিছু অংশ থলির মতো ফুলে যায়। সেটাকে রেটিনাতে লাল রঙের বিন্দুর মতো দেখা যায়।

⅄ কোষে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়লে কিছু উৎসেচক সক্রিয় হয়ে কিছু পদার্থ তৈরি করে যা নতুন রক্তজালিকা তৈরি করে। রেটিনাতে তাই নতুন রক্তজালিকা তৈরি হয়। অনেক সময় এই রক্তজালিকা থেকে রক্তক্ষরণ ঘটে। রেটিনাতে তন্তুময় কলার পরিমাণও বাড়ে। এই দুয়ের ফলে অন্ধত্ব ঘটে।

⅄ অনেক সময় রেটিনা তার পেছনের স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

⅄ ডায়াবেটিস রোগীদের ছানি পড়ার সম্ভাবনা ও ছানি থেকে নানা দুর্ভোগের সম্ভাবনা বেশি।

⅄ ডায়াবেটিস রোগীরা গ্লকোমাতে (চোখের ভেতরের তরলের চাপ বেড়ে যাওয়া) প্রায়শই আক্রান্ত হন।

নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করলে প্রথম অবস্থায়ই রোগ ধরা পড়ে। তখন চিকিৎসা করলে দৃষ্টিশক্তি প্রায় অটুট রাখা যায়। চোখের ডাক্তার অর্থাৎ অপথ্যাল্মোলজিস্টকে দেখাতে হয়। চোখের ডাক্তার না পাওয়া গেলে অপ্টোমেট্রিস্টদেরও দেখানো যেতে পারে।

রেটিনা চোখের একদম ভেতরের স্তর। রেটিনা দেখতে হলে বিশেষ চোখের ড্রপ দিয়ে চোখের মণিকে বড়ো করে অপথ্যাল্মোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। চোখে আলো পড়লে মণি ছোটো হয়ে যায়, তার মধ্যে দিয়ে পুরো মণিটা দেখা যায় না, তাই মণিকে বড়ো করার ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে রেটিনার ছবি তুলে রাখা হয় বিশেষ পরীক্ষায়।

কী ধরনের ডায়াবেটিস, কতদিন ধরে ডায়াবেটিস আছে, অন্য কোনো রোগ আছে কিনা—এই সব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ঝুঁকি কতটা।

ব্রিটেনে টাইপ ১ ডায়াবেটিসে ডায়াবেটিস ধরা পড়ার ৫ বছর পর থেকে চোখ পরীক্ষা শুরু করতে বলা হয়, তবে বয়ঃসন্ধির আগে সাধারণত চোখ পরীক্ষা করার দরকার পড়ে না। তবে আমাদের দেশে যেহেতু সকলের জন্য ঠিকঠাক চিকিৎসা বা রোগ ধরার ব্যবস্থা নেই, এদেশে রোগ ধরার পড়ার পরেই চোখ পরীক্ষা শুরু করা দরকার হতে পারে। কারও ডায়াবেটিসের সঙ্গে যদি দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকে, যদি চশমা ব্যবহার করতে হয়, তবে তাদেরও আগে চোখ পরীক্ষা করতে হতে পারে। প্রথম পরীক্ষার পর ১-২ বছর ছাড়া পরীক্ষা করাতে হয়। পরীক্ষায় খারাপ কিছু পাওয়া গেলে আরও আগে পরীক্ষা করাতে হতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পরীক্ষা করতে হয়। কেননা সাধারণত এই ধরনের ডায়াবেটিসে রোগ ধরা পড়ার আগে কয়েক বছর ধরেই ব্লাড সুগার বাড়তে থাকে। এই সময়ে কোনো উপসর্গ ছাড়াই চোখের সমস্যা হয়ে চলতে পারে। শুরুতেই পরীক্ষা করলে সমস্যা আছে কিনা, থাকলে কতটা গুরুতর, তার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কিনা—এসব বোঝা যায়। সমস্যা কিছু না থাকলে প্রথম চোখ পরীক্ষার ১-২ বছর ছাড়া ছাড়া চোখ পরীক্ষা করাতে হয়।

ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন

ডায়াবেটিসে পায়ে রক্ত চলাচল কমে যেতে পারে, তাছাড়া স্নায়ুগুলোতে রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার জন্য অনুভূতি কমে যায়। ফলে আঘাত লাগলে ব্যথার অনুভূতি হয় না, ক্ষতে বারবার আঘাত লাগে, ক্ষত গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। ডায়াবেটিসে পায়ের ঘা খুব দেখা যায়, ব্যথার অনুভূতি না থাকার জন্য রোগী অনেক সময় বাড়াবাড়ি হওয়ার আগে পায়ের ক্ষত রোগী খেয়ালও করেন না।

ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতিদিন পায়ের সমস্তটা দেখা উচিত, বিশেষ করে পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলো। কোথাও চামড়া ফেটেছে কিনা, ঘা বা ফোস্কা হয়েছে কিনা, গরম বা লাল কিনা, কড়া থাকলে তাতে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা—দেখা দরকার। স্নান করার সময় বা জামাকাপড় পরার সময় দেখে নেওয়া যায়। পায়ের নীচটা পুরো দেখার জন্য আয়না ব্যবহার করা যায়। আয়না দিয়ে দেখতে অসুবিধা হলে পরিবারের কারুর সাহায্য নেওয়া যায়।

ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতিদিন পায়ের সমস্তটা দেখা উচিত, বিশেষ করে পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলো। কোথাও চামড়া ফেটেছে কিনা, ঘা বা ফোস্কা হয়েছে কিনা, গরম বা লাল কিনা, কড়া থাকলে তাতে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা—দেখা দরকার।

ডাক্তারি পরীক্ষার সময় ডাক্তারের দেখা উচিত পায়ে রক্ত চলাচল ও অনুভূতি ঠিক আছে কিনা, কোনো ঘা আছে কিনা, পা ঠান্ডা কিনা, চামড়া পাতলা কিনা, নীলচে কিনা, চামড়া ফেটেছে কিনা।

ব্রিটেনের নিয়মে টাইপ ১ ডায়াবেটিসে রোগ নির্ণয়ের ৫ বছর পর থেকে পায়ের পরীক্ষা শুরু করলে চলে, আমাদের দেশে অবস্থা বুঝে আগেই পরীক্ষা শুরু করা যেতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসে প্রথম থেকেই পরীক্ষা করতে হয়।

ডায়াবেটিসে কিডনির রোগ

ডায়াবেটিসে কিডনির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—একে বলা হয় ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি। কিডনির ধমনিতে চর্বি জমে ও পুরু হয়ে গিয়ে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। আমাদের কিডনি অসংখ্য ছাঁকনির মতো একক দ্বারা তৈরি, যা গ্লোমেরুলা নামে পরিচিত। এই গ্লোমেরুলার অন্তঃবাহী ও বহির্বাহী ধমনি পুরু হয়ে যায়, ফলে গ্লোমেরুলার কাজ

করার ক্ষমতা কমে। গ্লোমেরুলার ভেতরে রক্তজালিকার মধ্যেও পূর্ব-উল্লিখিত পরিবর্তন দেখা যায়। তাছাড়া গ্লোমেরুলার মধ্যে মেসেঞ্জিয়াল স্ক্লেরোসিস ঘটে যা মূল কারণ কিডনির কার্যক্ষমতা হ্রাসের। এছাড়াও ডায়াবেটিসে কিডনিতে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ ও সংক্রমণ খুব সহজে ঘটে।

প্রস্রাব পরীক্ষা করে অ্যালবুমিনের মাত্রা দেখে বোঝা যায় কিডনির ছাঁকনি ক্ষমতা ডায়াবেটিসের জন্য কমে গেছে কিনা। প্রস্রাবে অল্প পরিমাণে অ্যালবুমিন (microalbuminuria) থেকে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি শুরু হয়েছে কিনা বোঝা যায়। প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের পরিমাণ বাড়লে নেফ্রোপ্যাথি খারাপ হচ্ছে বোঝা যায়।

প্রস্রাব পরীক্ষা করে অ্যালবুমিনের মাত্রা দেখে বোঝা যায় কিডনির ছাঁকনি ক্ষমতা ডায়াবেটিসের জন্য কমে গেছে কিনা। প্রস্রাবে অল্প পরিমাণে অ্যালবুমিন (microalbuminuria) থেকে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি শুরু হয়েছে কিনা বোঝা যায়।

ব্রিটেনের নিয়মে টাইপ ১ ডায়াবেটিসে রোগ-নির্ণয়ের পাঁচ বছর পর থেকে প্রস্রাব পরীক্ষা শুরু করা হয়, আমাদের দেশে অবস্থা বুঝে আগেই পরীক্ষা শুরু করা যেতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসে রোগ ধরা পড়ার পর থেকেই প্রস্রাব পরীক্ষা শুরু করা উচিত।

প্রস্রাবে অ্যালবুমিন থাকলে ব্লাড সুগার এবং রক্তে চর্বি (কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসেরাইড)-র মাত্রা কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। প্রস্রাবে অ্যালবুমিন বেরোনো ভালো না হলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলেও রক্তচাপ কমানোর ওষুধ—এসিই ইনহিবিটর (যেমন এনালাপ্রিল) বা এআরবি (যেমন লোসার্টান) দেওয়া হয়। এরা প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের পরিমাণ কমায়, ডায়াবেটিস জনিত কিডনির রোগকে প্রতিহত করে বা রোগ হওয়ার গতি কমায়।

ডায়াবেটিসে উচ্চ রক্তচাপ

অনেক ডায়াবেটিস রোগীর উচ্চ রক্তচাপও থাকে। উচ্চ রক্তচাপে সাধারণত কোনো উপসর্গ না থাকলেও এর জন্য দু-ধরনের খারাপ প্রভাব পড়ে—রক্ত সংবহনতন্ত্রে চাপ পড়ে এবং কিডনি ও চোখে ডায়াবেটিস-জনিত জটিলতা তাড়াতাড়ি বাড়ে।

ডায়াবেটিস রোগীদের কিডনির রোগ না থাকলে ১৪০/৯০ মিমি পারদ রক্তচাপের নীচে রাখলেও চলে, কিন্তু কিডনির রোগ থাকলে ১৩০/৮০ মিমি পারদের নীচে রাখতে হয়।

যদি ডায়াবেটিস রোগীর রক্তচাপ ১২০/৮০ মিমি পারদ-এর বেশি থাকে তাহলে তাঁকে ওজন কমিয়ে, ব্যায়াম করে, খাবারের নুন কমিয়ে, ধূমপান ছেড়ে আর মদ্যপানের মাত্রা কমিয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিকে আনতে পরামর্শ দেওয়া হয়। তাতে রক্তচাপ পুরোটা না কমলে বা দ্রুত রক্তচাপ কমানোর পরিস্থিতিতে রক্তচাপ কমানোর ওষুধ দেওয়া হয়।

ডায়াবেটিসে নার্ভের রোগ—ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি

ডায়াবেটিস রোগীদের প্রায় ৭০%-এর এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। স্নায়ুর রক্তনালীতে ক্ষতি হওয়ার জন্য রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটাই এর কারণ।

পেরিফেরাল অর্থাৎ প্রান্তীয় ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথিতে পায়ে ব্যথা, জ্বালা ভাব এবং অসাড়ভাব হয়। সাধারণত পায়ের আঙুলে সমস্যা শুরু হয়। তারপর হাত এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও সমস্যা দেখা যায়।

অটোনমিক নিউরোপ্যাথিতে আমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোর স্নায়ুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ফলে যৌনক্ষমতা হ্রাস, পাকস্থলীর সমস্যা (gastroparesis), প্রস্রাবে নিয়ন্ত্রণ হারানো, মাথা ঝিমঝিম করা, অজ্ঞান হয়ে পড়া—এই সব সমস্যা হতে পারে।

ডায়াবেটিসে দাঁত ও মাঢ়ীর রোগ

ডায়াবেটিসে দাঁতের গোড়ায় ময়লা জমে মাঢ়ী ফোলা ও লাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

নিয়মিত দাঁত মাজা, দাঁতের ফাঁকের ময়লা পরিষ্কার করার মাধ্যমে মাঢ়ীর রোগ কম রাখা যায়।

গর্ভাবস্থা ও ডায়াবেটিস

যাঁরা গর্ভবতী হওয়ার পরিকল্পনা করছেন বা ইতিমধ্যেই গর্ভবতী তাঁদের ডায়াবেটিস ও ডায়াবেটিসের সম্ভাব্য জটিলতাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভাবস্থার আগে ও গর্ভাবস্থার সময় ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখলে মা ও শিশুর অনেক জটিলতার সম্ভাবনা কমে।

ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয়

টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয়ের হরমোন নিঃসরণকারী একক আইলেটস অফ ল্যাংগারহ্যান্সের আয়তন ও সংখ্যা কমে এবং প্রদাহের সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে টাইপ টু ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয়ে অ্যামাইলয়েড ও তন্তুময় কলা জমা হতে থাকে । ফলে অগ্ন্যাশয়ের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই ডায়াবেটিসকে অবহেলা নয়। রোগটা সম্পর্কে জানুন আর নিয়মিত ডাক্তারি নজরদারিতে থাকুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস এবং ডা. মৃণ্ময়, এমবিবিএস। উভয়েই শ্রমজীবী মানুষদের জন্য পরিচালিত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত, ও যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা-আন্দোলনের কর্মী।

অথ DHA কথা

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞাপনে DHA নামক এক বস্তু নিয়ে হইচই-এর শেষ নেই। এটি নাকি শিশুখাদ্যে থাকলে বাচ্চা তা খেয়ে আইনস্টাইন বা অন্তত বিল গেটস্ হবেই। বিজ্ঞাপনদাতারা দিনে সহস্র বার তাই দাবি করেন। সত্যিটা কী? খুঁজে হাজির করছেন **ডা. অলোক হালদার**।

DHA কী?

DHA পুরো কথাটা হল docosahexaenoic acid। এটি এক ধরনের স্নেহপদার্থ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ডিএইচএ হল 22 কার্বন যুক্ত omega3 শ্রেণির স্নেহপদার্থ। এটি মস্তিষ্কের ধূসর অংশে এবং রেটিনার আলোক-সংবেদী অংশে প্রচুর পরিমাণে থাকে। মায়ের দুধের ডিএইচএ শিশুর চোখ এবং মস্তিষ্ক গঠনে সাহায্য করে।

ডিএইচএ কোথা থেকে পাওয়া যায়?

শিশুদের জন্য বুকের দুধ, মাছ, মাছের তেল, ডিমের কুসুম, বাদাম, তেল ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎস।

তাহলে কৌটোর দুধ আর হেলথ ড্রিংক-এর ডিএইচএ কোথা থেকে আসে?

HEXANE নামক এক বিষাক্ত রাসায়নিক-এর সাহায্যে Algae (শ্যাওলা) থেকে ডিএইচএ নিষ্কাশন করা হয়। Martek Biosciences Corporation, Colombia এই কোম্পানিটি ডিএইচএ এবং ARA (arachidonic acid) তৈরি করে। এ-দুটি তাদের পেটেন্ট করা যৌগ। এইভাবে নিষ্কাশিত ডিএইচএ একরকম তেল-এর মতো জিনিস। তাকে DHA oil-ও বলা হয়।

কীভাবে DHA oil তৈরি করা হয়?

Crupthecondinium cohnii জাতীয় আণুবীক্ষণিক শ্যাওলা বিশেষ ব্যবস্থায় শর্করা আর ঈস্ট সমৃদ্ধ পরিবেশে বৃদ্ধি করা হয়, তারপর শুকনো শ্যাওলা থেকে হেক্সেন (Hexene)-এর সাহায্যে DHA oil নিষ্কাশন করা হয়।

হেক্সেন (Hexene) একটি বিষাক্ত দ্রাবক। পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রিতে হেক্সেন উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়।

হেক্সেন-এর সাহায্যে তৈল নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা পাতন পদ্ধতিতে DHA-কে আলাদা করা হয়।

কৌটোর দুধের বা খাবারের DHA কি বাচ্চাদের বুদ্ধিমান বা মেধাবী করে? DHA কি নিরাপদ?

DHA যুক্ত দুধ বা খাবারের দাম ২৫-৩০% বেশি। তাই অনেক পরীক্ষাগারে এই “বাচ্চাদের বুদ্ধিমান বা মেধাবী” করার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মায়ের দুধ খাওয়া বাচ্চার থেকে DHA যুক্ত কৌটোর দুধ খাওয়া বাচ্চা উন্নত মস্তিষ্কের হয়েছে তা প্রমাণ করা যায়নি।

জেনে রাখা দরকার ডিএইচএ নিয়ে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরীক্ষা করা হয়নি। কিছু পরীক্ষা ইঁদুরের ওপর করা হয়েছে। বাঁদর-জাতীয় (Non human primates)-এর ওপরেও পরীক্ষা করা হয়নি। ডিএইচএ-র দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা কতটা, বা তা কর্কটরোগ উৎপাদনকারী কিনা তাও পরীক্ষা করা হয়নি। এমনকী ইঁদুরের ওপরেও এইসব নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরীক্ষা পুরো করা হয়নি। একটি পরীক্ষায়, ১৩ টি ইঁদুরের ওপর পরীক্ষায় ৫-টির লিভারের ওজন বেড়েছে এবং রক্তে প্রোটিনের মাত্রা বেড়েছে দেখা গেছে। এটা ডিএইচএ-র পার্শ্বক্রিয়া বলেই ধরা যায়। এছাড়া ডিএইচএ-র অন্য পার্শ্বক্রিয়া হিসেবে পাতলা পায়খানা, জন্ডিস, বমি, খিঁচুনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হেক্সেন কী?

একটি দ্রাবক। আমাদের চেনা জায়গার মধ্যে এটি বার্নিশ, আঠা, কালি ইত্যাদি তৈরি করতে রং-কারখানায় ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞাপনদাতারা ডিএইচএ সমৃদ্ধ কৌটোর দুধ প্রায় বুকের দুধের সমান দাবি করেন, এটা কি সত্যি?

বুকের দুধের কিছু কোষ (cellular elements) যেমন লিভার কোষ আছে, উৎসেচক বা অন্যান্য কার্যকরী জৈব যৌগ (bioactive compounds) আছে। এদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর অসাধারণ গুণ

মায়ের দুধে বিভিন্ন পদার্থ (composition) প্রতিদিন শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হয় যেটা কৌটোর দুধে সম্ভব নয়।

আছে। কৃত্রিমভাবে সেগুলো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া মায়ের দুধে বিভিন্ন পদার্থ (composition) প্রতিদিন শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হয় যেটা কৌটোর দুধে সম্ভব নয়।

সুতরাং এই ধরনের “কৌটোর দুধ প্রায় বুকের দুধের সমান” দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। আর, এমনিতেই কৌটোর দুধে ডিএইচএ থাকুক বা

না থাকুক যেসব শিশু কৌটোর দুধ খায় তাদের ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত মেনিঞ্জাইটিস, ফুসফুসের সংক্রমণ, পাতলা পায়খানা, জন্ডিস, কর্ণ সংক্রমণ, প্রস্রাবের সংক্রমণ, মধুমেহ, রক্ত-ক্যান্সার, হাঁপানি, স্থূলতা ইত্যাদির সম্ভাবনা বাড়ে, এটা প্রমাণিত।

আরেকটা জরুরি কথা বলা দরকার। আমেরিকার খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা US FDA (United States Food and Drug Administration) Martek Biosciences-এর ডিএইচএ অয়েল-কে কোনো শিশুখাদ্যে (infant formula-তে) যুক্ত করাকে অনুমতি দেয়নি। তার যুক্তি হল, যেহেতু এটি হেক্সেন নিষ্কাশিত সুতরাং জৈব পদার্থ হিসাবে গণ্য নয়।

তাহলে ডিএইচএ কীভাবে জৈব শিশু খাদ্যে দেওয়া হচ্ছে?

এর উত্তর জানতে হলে আমাদের আমেরিকার কর্পোরেট সংস্থার অর্থনীতি ও রাজনীতির দিকে তাকাতে হবে। হেক্সেন একটি হাইড্রোকার্বন দ্রাবক। অন্যান্য হাইড্রোকার্বন দ্রাবকের (যেমন—benzene) পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্মবিকলতা, অমনোযোগিতা, স্বল্পবুদ্ধি, মনোসংযোগহীনতা ইত্যাদি প্রমাণিত। হেক্সেন তেমনই একটি হাইড্রোকার্বন দ্রাবক হলেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য মেলে না। কিন্তু আমেরিকার আইনে হেক্সেন-এর অবস্থান একবার খতিয়ে দেখা যাক।

USEPA (United States environmental protection agency)-এর ১৮৮-টা বিপজ্জনক বায়ু দূষণ তালিকায় হেক্সেন একটি।

হেক্সেন তৈরির কারখানার শ্রমিকদের বিশেষ পেশাজনিত রোগ-ঝুঁকির (occupation health hazards)-এর আওতায় আনা হয়।

শিশুদের খাদ্যের মধ্যে অজৈব পদার্থ নিঃসন্দেহে USDA (United States Department of Agriculture)-এর Federal organic standard rules-এর পরিপন্থী । এ-ব্যাপারে ২০০৬ সালে একটি আইনি অভিযোগ করা হয়েছিল যেটি USDA Compliance officer বাতিল করে প্রস্তুতকারকদের সবুজ সংকেত দিয়ে দেয়। যেমনটা বহু সময় ইন্ডাস্ট্রির লবি করার প্রভাবে সারা পৃথিবীতে হয়ে থাকে।

Martek Biosciences এর ডিএইচএ-কে GRAS Status (generally recognised as safe) দেওয়া হয়েছে, ফলে FDA-এর ওই কোম্পানির ডিএইচএ-কে সেফটি সার্টিফিকেট না দিলেও শিশুখাদ্যে (ইনফ্যান্ট ফর্মুলা) সেটা যোগ করলে তা বন্ধ করার অধিকার নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মায়ের খাবারের ডিএইচএ-এর পরিমাণের ওপর মায়ের দুধের ডিএইচএ-এর পরিমাণ নির্ভর করে। আমেরিকান মায়েদের খাদ্যাভাসের কারণে দুধে ডিএইচএ-র পরিমাণ ভারতীয় মায়েদের থেকে কম থাকে।

তাহলে আমরা (যারা জীবনে কৌটোর ডিএইচএ খাইনি) এবার গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসি যে বাচ্চাদের বহুজাতিক সংস্থার হেক্সেন বিষযুক্ত কৌটোর ডিএইচএ খাওয়াব, না মাকে গর্ভাবস্থায় সুষম খাবার এবং জন্মের পর শিশুকে মায়ের দুধ আর ডিএইচএ-সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সুষম নিরাপদ খাবার খাওয়াব। সম্ভবত আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর বা এ পি জে আবদুল কালাম কেউই কৌটোর ডিএইচএ খাননি।

বিচারটা মায়েদের উপরেই ছেড়ে দিলাম। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অলোক হালদার, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:
দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), i'ডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজস্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজস্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়া হাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।
যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com
ফোন-৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ওষুধের পার্শ্বক্রিয়ায় প্রাণঘাতী চর্মরোগ

সাধারণ মানুষের ধারণা, চামড়ার রোগে রোগী প্রাণে মরে না। আর ওষুধের পার্শ্বক্রিয়ায় কোনো রোগ হলে মানুষ আগেভাগেই ভেবে বসেন, ডাক্তার ভুল ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু মারাত্মক দুটি চর্মরোগ—টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস ও স্টিভেন জনসন সিন্ড্রোম—এরা চর্মরোগ, কিন্তু প্রাণে মারে। আর ভুল ওষুধ দেবার ফলে এইসব রোগের সৃষ্টি হয়, তাও নয়। তাহলে করবেন কী? লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

সপ্তাহ দুয়েক আগে হঠাৎ আমাকে জরুরি তলব। হাসপাতাল আসুন। একেবারে এখনি।

ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ আমি। আমার বন্ধুরা মাঝে মধ্যে আধা-ঠাট্টা আধা-সিরিয়াস সুরে বলে, ইস, তোর কী মজা! ইমার্জেন্সি নেই। রাতে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোস। সেই আমাকে হঠাৎ হাসপাতালে এরকম জরুরি তলব কেন?

রোগ গুরুতর। ডাক্তারি ভাষায় তার নাম টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। কিন্তু সেজন্য হাসপাতাল আমাকে তলব করেনি, মেডিসিন বিভাগে রোগীকে ভর্তি করে মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন। হাসপাতাল আমাকে ডেকেছে এইজন্য যে আমি রোগীকে ক-দিন আগে দেখে যে ওষুধ দিয়েছিলাম, তার প্রতিক্রিয়ায় রোগীর এই মারাত্মক রোগ--টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। আমাকে গিয়ে সেটা দেখতে হবে।

গিয়ে দেখি রোগীপক্ষ আমার ওপর মহা খাপ্পা। আমার ওষুধ নিশ্চয়ই খুব খারাপ, বিপজ্জনক। আমি কেন সেটা রোগীকে দিয়েছি? আমি দেখলাম, পেনিসিলিন গোত্রের খুব চালু একটি ওষুধ রোগীকে আমি লিখেছিলাম, সে ওষুধ লেখার কারণও ছিল যথেষ্ট। কমবয়সী রোগী, সে ওষুধের জেরে তার মরোমরো অবস্থা। রোগীর বাবা-কাকা ও আরও কিছু প্রতিবেশী এসেছিলেন, তাঁরা ভয়ানক উত্তেজিত, মাথা ঠান্ডা রেখে কথা শোনার অবস্থাই নেই। শেষমেশ রোগীর এক জ্যাঠামশায়কে পাওয়া গেল, ওষুধের দোকান আছে। তিনিই আমার কথাটা অন্যদের বুঝিয়ে বললেন—ওই ওষুধটা খুব সাধারণ একটা ওষুধ, তাঁর দোকান থেকে হাজার হাজার বিক্রি হয়, বাপনের (রোগীর ডাকনাম) সহ্য হয়নি। এরকমটা হতে পারে, কিন্তু মুশকিল হল, কোন ওষুধ কোন মানুষের এরকম বিপদ ডেকে আনবে সেটা কোনো ডাক্তারই আগেভাগে বলতে পারেন না। রোগীপক্ষ শান্ত হলেন, আমি বিপদ থেকে বাঁচলাম; আজকাল যা দিন পড়েছে! কিছু মানুষ চট করে না বুঝেই ডাক্তারকে দোষী সাব্যস্ত করেন, এমনকী ডাক্তারকে মারধরের ঘটনাও বিরল নয়। আর শেষের ভালো খবর হল, বাপন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছে। এটা নেহাত কম কথা নয়, কেননা টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস হলে আর্ধেক মানুষ মারা যান!

চিত্র ১. টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস

পড়ুয়া পাঠকদের হয়তো এতক্ষণে অনুরাধা সাহার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা মনে পড়েছে। ১৯৯৮ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে অনুরাধা মারা গেছিলেন কলকাতার আমরি (AMRI) হাসপাতালে—কারণ টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। তাঁর স্বামী আমেরিকা-প্রবাসী ডাক্তার কুণাল সাহা আমরি-র চার ডাক্তারকে দায়ী করে মেডিক্যাল কাউন্সিলে নালিশ করেছিলেন, আদালতে মামলাও করেছিলেন। শেষে সুপ্রীম কোর্ট ডাক্তারদের ভুল হয়েছে এমন রায় দেন, আর ডাক্তারদের ও আমরি (AMRI) হাসপাতালের ওপর মোটা অঙ্কের জরিমানা ধার্য করেন। পাঠকদের কেবল এই কথাটা স্মরণ করিয়ে রাখি, যে ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের জন্য টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে কুণাল অভিযোগ করেননি, আদালতও তাঁকে দোষী বলে সাজা দেয়নি। তার কারণ সহজবোধ্য—অনেক ওষুধ থেকেই টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস হতে পারে, কিন্তু সেটা হয় খুব বিরল ক্ষেত্রেই; তাই ডাক্তার ওষুধ লিখে ভুল করেছেন, এমন

নয়। টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস হয়ে যাবার পর যাঁরা চিকিৎসা করেছিলেন, আদালত তাঁদের কাজে ও হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় গাফিলতি খুঁজে পেয়ে জরিমানা করেছেন। এটা মনে রাখা খুব দরকার, কেননা ক্ষতিকর পার্শ্বক্রিয়া প্রায় সব ওষুধেই হতে পারে, কিন্তু সেইসব পার্শ্বক্রিয়ার সম্ভাবনা বিরল হলে তবেই কোনো ওষুধকে সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা ওষুধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পার্শ্বক্রিয়া হবেই না, এমন ওষুধ দিতে গেলে কোনো ওষুধই দেওয়া সম্ভব নয়। টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই ভয়ানক রোগ কোনো ওষুধ ছাড়াও হতে পারে, আর অনেক সময় এ রোগের কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছি এইজন্য যে অনেক সময় রোগীর আত্মীয়স্বজন কোন ডাক্তার ওষুধ লিখেছেন, আর সেই ওষুধ লেখা ঠিক হয়েছিল কিনা, সেই নিয়ে অনেক সময় ও প্রচেষ্টা খরচ করে ফেলেন। একে তো সে ডাক্তারের কোনো দোষই নেই, কে কেন ওষুধ লিখেছিল, সেটার পেছনে সময় খরচ করতে গিয়ে অনেক সময় রোগীর চিকিৎসায় দেরি হয়ে যায়, বা ভুল চিকিৎসা শুরু হয়। তার ওপর ওষুধ ঠিক কারণে লেখা হোক আর ভুল কারণে, রোগীর ঐ ওষুধে 'অ্যালার্জি' থাকলে টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস হতেই পারে। 'অ্যালার্জি' কথাটা এখানে একটু অবৈজ্ঞানিক, লোকের মুখে চালু শব্দ হিসেবে ব্যবহার করলাম, সে ব্যাপারে পরে আবার আসব।

ওষুধে অ্যালার্জি? নাকি পার্শ্বক্রিয়া?

ওষুধ থেকে নানা রকম অবাঞ্ছিত ক্রিয়া হয়। ইংরাজি হলেও 'সাইড এফেক্ট' কথাটা আমাদের বেশি চেনা। ডাক্তার, রোগী, ওষুধের দোকানদার—সবাই বলেন, সাইড এফেক্ট হয়েছে। শুদ্ধ বাংলায় বলি, পার্শ্বক্রিয়া, বা অবাঞ্ছিত ক্রিয়া। সব অবাঞ্ছিত বা পার্শ্বক্রিয়া কিন্তু একই পদ্ধতিতে হয় না। যেমন ধরুন, গায়ের ব্যথা কমানোর ওষুধ খেলে পেটে ব্যথা হতে পারে। এটা কেন হয়? ব্যথা কমানোর ঐসব ওষুধের একটা কাজই হল পাকস্থলির অ্যাসিড ক্ষরণ বাড়িয়ে দেওয়া, বা অন্যভাবে পাকস্থলির ভেতরের দেওয়ালের ক্ষতি করা। সব রোগীর ক্ষেত্রেই এই ওষুধগুলো কম বা বেশি পরিমাণে এই অযাচিত কাজটি করে। তাতে কারও ক্ষতি বেশি হয়, পেটে ব্যথা হয়, এমনকী রক্তবমিও হতে পারে। তাঁদের এই ওষুধ দেওয়া যায় না, বা বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে অন্য ওষুধ দিয়ে তবে দেওয়া যায়। এটা ওষুধের নিজস্ব ধর্ম, রোগীবিশেষে এর কমবেশি হয়, কিন্তু একেবারে না হবার উপায় নেই। এটা অ্যালার্জি নয়।

অন্যদিকে, ব্যথা কমানোর ওষুধ অ্যাসপিরিন খেয়ে প্রায় কারোরই আমবাত বেরোয় না, কিন্তু হয়তো আপনার সারা গায়ে লাল লাল চাকা চাকা হয়ে ফুলে গেল। ডাক্তার বললেন, আমবাত হয়েছে। এটা আপনার শরীরের বিশেষ ধর্ম ও ওষুধের ধর্ম মিলিয়ে হয়েছে—কিন্তু কার যে অ্যাসপিরিন খেয়ে আমবাত হবে আর কার হবে না, তা আগেভাগে বলা যায় না। যার হবার তার অল্প অ্যাসপিরিন খেলেও হবে, যার হবার নয়, তার অনেক অ্যাসপিরিন খেয়েও আমবাত হবে না। কিন্তু যার অল্প অ্যাসপিরিন খেলে পেটে ব্যথা হয় না, তারও একগাদা অ্যাসপিরিন খেলে, বা খালিপেটে অ্যাসপিরিন খেলে, পেটে ব্যথা হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। অ্যাসপিরিন খেয়ে আমবাত—এটা হল রোগীর নিজস্ব ধর্ম, ডাক্তারি ভাষায় বলে ইডিওপ্যাথিক প্রতিক্রিয়া (idiopathic reaction)।

অভিজ্ঞ পাঠক হয়তো এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন, আরে, সরাসরি অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি বলে দিলেই তো হয়, ইডিওপ্যাথিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নতুন জটিল শব্দ আমদানি করার কী দরকার! কিন্তু না, অ্যাসপিরিনে আমবাত বেরোলেও, আর আমবাতকে আমরা চলতি কথায় 'অ্যালার্জি বেরিয়েছে' বললেও, ডাক্তারি শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ বজায় রাখতে গেলে অ্যাসপিরিনে আমবাত-কে ইডিওপ্যাথিক প্রতিক্রিয়া বলতে হবে, 'অ্যালার্জি' বলা যাবে না। ডাক্তারি প্রতিশব্দ হিসেবে 'অ্যালার্জি' কথাটার একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে, 'অ্যালার্জি' হতে গেলে অ্যান্টিজেন লাগে। তাই অ্যাসপিরিন বা মরফিন থেকে আমবাত হলে ডাক্তারি পরিভাষায় তাকে অ্যালার্জি বলা যাবে না। অথচ পেনিসিলিনে আমবাত হলে তা 'অ্যালার্জি', এমনকী পেনিসিলিন-জাতীয় ওষুধে প্রায় সব চামড়ার 'i¨vk'-ই 'অ্যালার্জি'। কিন্তু পেনিসিলিন গোত্রের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, যেমন অ্যাম্পিসিলিন, কিছুদিন খাবার পর অনেক সময় ডায়ারিয়া হয়, সেটা কিন্তু আদৌ 'অ্যালার্জি' নয়। যেকোনো অ্যান্টিবায়োটিক, বিশেষ করে অ্যাম্পিসিলিনের মতো যে সব অ্যান্টিবায়োটিকের অনেক রকম জীবাণু মারার ক্ষমতা থাকে, সেগুলো খেলে আমাদের অন্ত্রে বাস করা উপকারী জীবাণুরা সেই অ্যান্টিবায়োটিকে মারা যায়, অপকারী জীবাণুর দল দ্রুত বৃদ্ধি পায়—ফলে ডায়ারিয়া হয়। এটাও 'অ্যালার্জি' নয়। এটা ওষুধের নিজস্ব ধর্ম ও রোগীর অবস্থার কারণে হয়—এই ব্যাপারটা চিকিৎসক আগে থেকে খানিকটা আন্দাজ করতে পারেন, এসব ওষুধ লেখার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে বলতে পারেন ডায়ারিয়া হলে ওষুধ বন্ধ করবেন। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলতে পারেন না কোন রোগীর ডায়ারিয়া হবে।

কিন্তু অ্যালার্জি নাকি অ্যালার্জি নয়, সে নিয়ে এত প্যাচাল পাড়ছি কেন? পাড়ছি এইজন্যই যে ডাক্তারদের মুখের ভাষা অনেক সময় রোগী বোঝেন না, এটাও বোঝেন না যে সব রোগ, বা ওষুধের সব অবাঞ্ছিত ক্রিয়া, তাঁদের জানা কয়েকটা শব্দে বোঝা সম্ভব নয়। সেখানে দেখা যায় ডাক্তার সরল করে বললেও বিপদ, খানিক পড়াশুনো করা রোগী ভাবেন ডাক্তার ভুল বলছেন। আবার ডাক্তার পুরো জটিলতা বোঝাতে গেলে তার ঠেলাতেই রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা। তাই এই নিবন্ধে ওষুধের অবাঞ্ছিত ক্রিয়া, সেটা আগে কতটা অনুমান করা সম্ভব, সে সবই বলব, কিন্তু ঠিক কী কারণে অবাঞ্ছিত ক্রিয়াটি ঘটল, সেটা হয়তো উহ্যই থাকবে। পাঠকের কাছে অনুরোধ, ডাক্তারদের এই দ্বিবিধ সঙ্কট তাঁরা একটু বুঝবেন। মূল কথাটা হল, ওষুধের ভয়ংকর পার্শ্বক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে আগে অনুমান করা আদৌ সম্ভব নয়—যেমন পেনিসিলিন-জাতীয় ওষুধ থেকে টক্সিক

এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। আবার কিছু পার্শ্বক্রিয়া হতেও পারে, সেটা জেনেও চিকিৎসককে ওষুধ লিখতে হয়—যেমন পেটব্যথার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বেদনানাশক, বা ঘুমভাব হবার সম্ভাবনা জানা থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টিহিস্টামিন, ডায়ারিয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টিবায়োটিক। তবে শেষের ক্ষেত্রগুলোতে রোগীকে একটু সতর্ক করে দেওয়া যায়।

টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস—এক মারণরোগ

টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস দিয়েই শুরু করি। অনেকেরই ধারণা আছে চামড়ার রোগ বড়জোর খুব জ্বালাতে পারে, কিন্তু প্রাণে মারে না। এটা ভুল ধারণা। টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস ও স্টিভেন জনসন সিন্ড্রোম—এ দুটি ওষুধের অবাঞ্ছিত ক্রিয়াজনিত অসুখ। কিন্তু দুটিই প্রাণঘাতী হতে পারে। পেমফিগাস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমেটোসাস-ইত্যাদি নানা ওষুধজনিত নয় এমন অসুখও প্রাণঘাতী হতে পারে। তবুও বলব, এদের মধ্যে টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস সবচেয়ে মারাত্মক। এটা হঠাৎ করেই হয়, আর পাশ্চাত্য দেশের উন্নত ব্যবস্থাতেও আর্ধেক রোগীই মারা যান।

টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস আর স্টিভেন জনসন সিন্ড্রোম—এই দুই ওষুধের অবাঞ্ছিত ক্রিয়াজনিত অসুখকে একসাথে বর্ণনা করাই ভালো। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, এ দুটো একই অসুখের রূপভেদ, তফাত খালি মাত্রায়। কারণ যাই হোক না কেন, রোগের চেহারা একই রকম। ডাক্তাররা কেমন করে চিনতে পারেন এদের? যা যা হতে পারে তা হল—

☞ শুরুতে জ্বর, গলা ব্যথা, ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগা, মাথাব্যথা, গাঁটে ব্যথা, গায়ে ব্যথা, বমি, ডায়ারিয়া।

☞ চামড়ার দৃশ্যমান i¨Vk যেকোনো জায়গায় শুরু হতে পারে, তবে হাত-পায়ের পাতার দু-দিকে, ও হাতপায়ে বা দেহকাণ্ডের ভাঁজের বিপরীত দিকে (Extensor surface) বেশি হয়। স্টিভেন জনসন সিন্ড্রোম হল তুলনায় মৃদু—দেহের চামড়ার শতকরা ত্রিশভাগের চাইতে কম অংশ রোগগ্রস্ত হয়, মৃত্যুর সম্ভাবনা কম। টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস-এ দেহের শতকরা ত্রিশভাগের চাইতে বেশি ত্বক রোগগ্রস্ত হয়, মৃত্যুর সম্ভাবনাও বেশি।

☞ i¨Vশ-এ সাধারণত চুলকানি থাকে না। ছোটো দানা, চামড়ার রঙের পরিবর্তন (লালচে কালো), ফোস্কা, পাশাপাশি নানা i¨Vk জুড়ে যাওয়া, লালচে কালো ছোপের মাঝখানে কালো গোল গুটি বা ফোস্কা (টার্গেটের মতো দেখতে)—এগুলো খুব দেখা যায়।

☞ মুখ, চোখ, জননাঙ্গ ও পায়ু—এদের শ্লেষ্মাঝিল্লিও আক্রান্ত হয়। অনেক সময় রোগী মুখে খেতে পারেন না। প্রস্রাব করতে অসুবিধা বা জ্বালা হয়।

☞ চামড়া পুড়ে গেলে যেমন কালো হয়ে যায় ও চামড়ার ওপরের স্তর আলগা হয়ে উঠে আসে, টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস-এ তেমনভাবেই দেহের অনেকটা অংশের চামড়ার ওপরের স্তর কালো হয়ে যায়, হাত দিলে উঠে আসে। এভাবে দেহের একটা বড়ো অংশের ত্বক খসে যেতে পারে। স্টিভেন জনসন সিন্ড্রোম-এ এটা হয় না, বা হলেও কম জায়গা জুড়ে হয়—তাই এতে মৃত্যুহার কম।

হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়। যেসব হাসপাতালে পুড়ে যাওয়া রোগীদের জন্য আলাদা ‘বার্ন ইউনিট’ আছে, সেখানে ঐ ইউনিটে চিকিৎসা করাই ভালো। পুড়ে যাওয়া রোগীদের মতোই, এই রোগীদের সাধারণ যত্নের (Nursing care) গুরুত্ব খুব বেশি—শিরার মধ্যে দিয়ে যথাযথ ফ্লুইড (চলতি কথায় স্যালাইন) দেওয়া, পুষ্টি ও শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখা, যাতে অন্য রোগীদের থেকে কোনো সংক্রমণ এদের না হতে পারে সেটা দেখা, সংক্রমণ হলে দ্রুত চিকিৎসা—এরকম অনেক ছোটো ছোটো ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজরই রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা কিছু আছে, তা নিয়ে চিকিৎসক মহলেই বিতর্ক আছে। এখানে সেগুলো আলোচনার দরকার নেই। কিন্তু একটি ‘সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা’ ভুললে চলবে না—যদি ওষুধ থেকে এই রোগ হয়ে থাকে তো সেই ওষুধটি চিহ্নিত করা ও সারা জীবনের মতো সে ওষুধ ব্যবহার না করা। রোগীর পক্ষ থেকে ওষুধের কাগজ ঠিকঠাক রেখে দেওয়া তাই খুব দরকার। আমাদের দেশে অনেক সময়ই ওষুধের দোকানদারের কথায় ওষুধ কিনে খাওয়া হয়, তারপর কী ওষুধ খাওয়া হয়েছিল সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া আছে একই ওষুধের অজস্র ব্র্যান্ডনাম; ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পেয়েও ব্র্যান্ডনাম অপরিচিত হবার কারণে আসল ওষুধটা যে কী সেটা বুঝতে মাথার চুল ছিঁড়তে হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনফেকশন, যেমন সামান্য হারপিস ভাইরাস সংক্রমণ, থেকে এই ভয়ানক রোগ হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। সে সব রোগীদের সারিয়ে তুললেও পরে আবার রোগ হবার সম্ভাবনা নিয়ে কিছু বলা যায় না, বা রোগ আটকানোর জন্য কিছু করাও যায় না।

যে সব রোগী বয়সে তরুণ, স্বাস্থ্য এমনিতে ভালো, অন্য কোনো গুরুতর অসুখ যেমন এইডস বা হার্টের অসুখ নেই, তাদের বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা বেশি। আবার অসুখটা শরীরের কতখানি জায়গা জুড়ে আক্রমণ করেছে, এবং চিকিৎসা সময়মতো শুরু হয়েছে কিনা, দায়ী ওষুধটি দ্রুত চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা, চিকিৎসা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা—তার ওপরেও বাঁচা-মরা অনেকাংশে নির্ভর করে।

এই রোগ হয়েছে সেটা ডাক্তার ছাড়া অন্য কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেন না, এমনকী অনেক সময় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পর্যন্ত রোগের প্রথম দশায় রোগ চিনতে পারেন না। কিন্তু চিকিৎসক রোগ শনাক্ত করলে হাসপাতালে ভর্তি করেই চিকিৎসা করতে হবে। চামড়ার রোগ, অতএব তেমন প্রাণঘাতী নয়, এমন ভেবে অবহেলা করলে বিপদ অনিবার্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করেন।

ফিটের ব্যামো

ডা. সুমিত দাশ

বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে শরৎ সাহিত্যে এই 'ফিটের ব্যামো'য় ভোগা মহিলার কথা বার বার এসেছে। আর আমরা যারা গ্রামে-গঞ্জে ছোটোবেলা কাটিয়েছি আমাদের আশপাশে এরকম ফিটের ব্যামোয় ভোগা দুই একজন মহিলার কথা প্রায় সবাই জানতাম।

ঘটনাটা এরকমভাবে ঘটত। বাড়িতে কোনো কারণে চিৎকার চেঁচামেচি, তর্কবিতর্ক হচ্ছে বা আবেগপুর্ণ কোনো ঘটনা ঘটছে যেখানে ওই মহিলাও শামিল। হঠাৎ চরম মুহূর্তে ওই মহিলা গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়বেন। চোখ বন্ধ, দাঁতে দাঁত চেপে থাকবেন। অনেকে এই ঘটনাকে 'দাঁতি' পড়াও বলেন। মহিলাকে ডাকলেও সাড়া দেবেন না। মনে হবে জ্ঞান হারিয়েছেন। অর্থাৎ তার 'ফিট' হয়েছে বা মূর্ছা গেছেন।

কিন্তু এই ফিটের ব্যামো শুধু 'ফিট' বা মূর্ছারূপে আসে না। একটু পিছনে তাকালে বিষয়টা বোঝা যাবে। একটা সময় এই রোগকে হিস্টিরিয়া বলা হত। তখন মানুষের নজরে যে রোগগুলো আসত- একটা মেয়ের হাত, পা বা দেহের কোনো একটা দিক অবশ হয়ে গেছে অথবা কথা বন্ধ হয়ে গেছে। আর এই রোগগুলো নিয়ে একটা অদ্ভুত তত্ত্ব দেওয়া হল। মেয়েদের দেহে ইউটেরাস (Hysterus থেকে কথাটা এসেছে, আর Hysteria কথাটা Hysterus থেকে এসেছে।) থাকে। মনে করা হল এটা অসুস্থ অবস্থায় চলমান অঙ্গ হয়ে যায়। আর যখন যে অঙ্গে যায় তখন সেই অঙ্গে রোগটি দেখা দেয়। পরবর্তীকালে দেখা গেল রোগটি ছেলেদেরও হয়। তাই চলমান ইউটেরাস তত্ত্ব বাদ গেল। বলা হল কনভার্শন ডিসঅর্ডার (Conversion Disorder)। অর্থাৎ মানসিক উদ্‌বেগ শারীরিক উপসর্গে পরিবর্তিত হয়েছে বা Converted হয়েছে। তাই এই নাম। কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রয়েড। পরবর্তিকালে পল ব্রিকেট (Paul Briquet) এবং জাঁ মার্টিন চারকোট (Jean Martin Charcoat) এই রোগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তাঁরা দেখান বংশগতির প্রভাব এবং মানসিক আঘাত এই রোগের প্রধান কারণ। বর্তমানে রোগটিকে ফাংশনাল নিউরোলজিকাল ডিসঅর্ডার (Functional Neurological Disorder) বলে। এরকম নামের কারণ হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের 'ফাংশন' বা কাজের আপাত অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায় কিন্তু কারণটা মানসিক। যাইহোক নামের কচকচানি ছেড়ে আমরা এবার মূল বিষয়ে ঢুকি।

কাদের হয়

দেখা গেছে এক লাখ লোকের মধ্যে ১১ জনের এই রোগ হয়। রোগটা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দ্বিগুণ বেশি হয়। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মেয়েদের দশগুণ বেশি হয়। ১০ বছরের আগে আর ৩৫ বছরের পরে প্রথম বারের জন্যে এই রোগ সাধারণত হয় না। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের এই রোগ বেশি হয়। রোগটির সঙ্গে উদ্‌বেগ রোগ, অবসাদ রোগ এবং শারীরিকীকরণ (Somatoform Disorder) থাকার সম্ভবনা বেশি থাকে।

কেন হয়

কোনো-না-কোনো মানসিক দ্বন্দ্বের কারণে রোগটা হয়। কিন্তু দ্বন্দ্বের জন্য কীভাবে হয় তার নানা রকম ব্যাখ্যা আছে।

মনোগতিবিদ্যাতে বলা হয় অবচেতন মনের কোনো ইচ্ছা (আগ্রাসী বা যৌনতামূলক) এবং তা প্রকাশের মানসিক বাধার দ্বন্দ্বের জন্যে এই রোগ হয়। শিক্ষণ তত্ত্ব মতে আর পাঁচটা বিষয়ের মতো মানুষ ছোটোবেলায় পাঁচজনকে দেখে এটা শেখে। অর্থাৎ মানসিক চাপ মুক্তিতে দেহে রোগের উপসর্গ সৃষ্টি করে সহানুভূতি আদায় করাটা সে শেখে। বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক রিসার্চ দেখিয়েছে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর দেহে 'কর্টিজোল' হর্মনের মাত্রা বেড়ে যায়।

কী কী উপসর্গ নিয়ে আসে

মনে রাখতে হবে রোগীর দেহে একটা স্নায়ুঘটিত রোগের উপসর্গ ফুটে উঠলেও সেটা আসলে ওই রোগ নয়; ডাক্তারি পরীক্ষা বা ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় রোগের সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আরও গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে, মনে রাখতে হবে রোগী ইচ্ছা করে রোগের উপসর্গ

তৈরি করে না বা রোগের ভান করে না। এটা অবচেতনভাবেই তৈরি হয়। এর ফলে তার প্রাথমিক লাভ হয় যে দ্বন্দ্ব তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তা থেকে সাময়িক মুক্তি। আর আনুষঙ্গিক লাভ হচ্ছে অন্য মানুষের সহানুভূতি পাওয়া। হয়তো একটা অনিচ্ছার কাজের চাপে তার রোগটি হল, কিন্তু সেই রোগের কারণে তাকে কাজটা করতে হল না।

সবথেকে বেশি আসে হঠাৎ করে প্যারালিসিস, অন্ধ বা বোবা হয়ে যাওয়া, এছাড়া আসে ‘ফিট’ বা ‘মূর্ছা’।

মূর্ছা গেলে রোগী হঠাৎ করে পড়ে যায় এবং অজ্ঞান হয়ে যায়। তবে এই পড়ায় সাধারণত তার চোট হয় না। কারোর কারোর মৃগী রোগীর মতো দেহ কাঁপতে থাকে। তবে মৃগী রোগীর মতো জিভ কেটে যাওয়া, প্রস্রাব করে ফেলা কনভার্শন ফিটে সাধারণত হয় না। অজ্ঞান হওয়াটা অনেক বেশিক্ষণ ধরে হয়। এবং সাধারণত অন্য কোনো মানুষের সামনে হয়।

এছাড়া আসে হঠাৎ কারোর একটা হাত বা একটা পা বা দেহের একটা দিক পক্ষাঘাত রোগীর মতো অবশ হয়ে যাওয়া। অনেকের পায়ে মোজা পরার অংশ এবং হাতে গ্লাভস পরার অংশে কোনো অনুভূতি থাকে না।

কেউ কেউ হঠাৎ বোবা হয়ে যায়। কেউ হঠাৎ অন্ধ হয়ে যায় তবে যার ‘অন্ধত্ব’ হয়েছে সে ঘরে হাঁটলেও সাধারণত কোনো আসবাবপত্রে ধাক্কা খায় না।

আর কিছু ক্ষেত্রে রোগী অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটে। দেহের একটা অংশ বা পুরো দেহ কাঁপে, কারোর কারোর চোখে-মুখে হঠাৎ সংকোচন বা ‘টিক’ দেখা যেতে পারে।

কেউ কেউ খুব জোর হাঁপাতে পারে। অনেটা ‘অ্যাজমা’ রোগীর মতো। কেউ কেউ মৃত প্রিয়জনের রোগের উপসর্গে ভুগতে পারে।

রোগের চিকিৎসা ও ভবিষ্যৎ

রোগটা মূলত অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হয়। তাই রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে এই রোগীর প্রতি বেশি মনোযোগ না দেওয়াটা চিকিৎসার একটা অংশ। সাধারণত ৯৫% রোগী দু-সপ্তাহর মধ্যে আপনাআপনি ভালো হয়ে যায়। ২০-২৫% রোগীর এক বছরের মধ্যে রোগটি আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্যারালিসিস, অন্ধত্ব, বোবা হয়ে যারা আসে তাদের ভবিষ্যৎ ভালো আর যারা কাঁপুনি বা ফিট নিয়ে আসে তাদের ভবিষ্যতে বারবার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রোগ সারানোর ক্ষেত্রে তার দ্বন্দ্ব নিরসনে মনশ্চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে উদ্‌বেগনাশী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। আর এই রোগের সঙ্গে উদ্‌বেগ বা অবসাদ রোগ থাকলে তার চিকিৎসা আলাদা করা দরকার। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ চিকিৎসক। হাওড়ার একটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যুক্ত আছেন।

বিশেষ ঘোষণা

অনিবার্য কারণবশত বস্তি জীবনে জনস্বাস্থ্য সমস্যা-র শেষ পর্ব এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

Advt.

অনীক

‘অনীক’ পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। ‘অনীক’-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

ক্যান্সার ও তার চিকিৎসা নিয়ে যৎসামান্য

ক্যান্সার নিয়ে আমাদের যে ভয় আছে তা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু নিকটজনের কারও ক্যান্সার হয়েছে শুনলেই যে প্রবল অসহায়ত্ব আমাদের গ্রাস করে, সেটার তেমন কারণ নেই। সব ক্যান্সার একরকম মারাত্মক নয়, আর এদিক-ওদিক দৌড়ে সময় নষ্ট না করে ঠিকঠাক চিকিৎসা করালে প্রায় সব ক্যানসারেই কিছুটা উপকার মেলে—লিখছেন **ডা. প্রদীপকুমার মাইতি**।

ক্যান্সার কী?

প্রাণীদেহে বৃদ্ধি (গ্রোথ) একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষ মাতৃগর্ভে আসে একটিমাত্র কোষ নিয়ে। বৃদ্ধি হয় বলেই একটি কোষ থেকে ভ্রূণ তৈরি হয়, ভ্রূণ বড়ো হয়ে হয় শিশু, আবার শিশু বাড়তে বাড়তে প্রাপ্তবয়স্ক ও পূর্ণাঙ্গ দেহ লাভ করে। কিন্তু বাড়তে বাড়তে সে দৈত্যাকৃতি হয় না। তার পাঁচটা আঙুল, অন্য মানুষের পাঁচ আঙুলের মতো অর্থাৎ আমাদের প্রত্যাশা মতোই বাড়ে। দুটো হাত--একটা বড়ো, একটা ছোটো হয় না। মানুষের হাত-পা মানুষের মতো, হাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাতির মতোই হয়। অর্থাৎ এই বৃদ্ধি একটা নিয়ম মেনে চলে, একটা নিয়ন্ত্রণ আছে। আবার এই বৃদ্ধি এক সময় থামতেও জানে।

ক্যান্সারও এক প্রকার বৃদ্ধি। কিন্তু সে থামতে জানে না। সে বল্গাহীন। চালক (নিয়ন্ত্রক) হীন গাড়ি যে রকম পথ-ঘাটের তোয়াক্কা না করে যেকোনো দিকে দৌড়োতে থাকে, পাশাপাশি গাড়ি-ঘোড়া-বাড়ি-পথচলতি মানুষকে ধাক্কা মারে, এ-ও তেমনি প্রথমে যে অঙ্গে শুরু হয় সেই অঙ্গের কাজ নষ্ট করে, পরে শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যান্য অঙ্গের ভিতর ঢুকে পড়ে ওই অঙ্গগুলির কাজকর্মও ব্যাহত করে। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি থামাতে না পারলে যেমন চরম দুর্ঘটনা ঘটে, তেমনই চিকিৎসা করে ক্যান্সার নির্মূল করতে না পারলে সে-ও মানুষের চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আর যত শুরুর অবস্থায় তাকে থামানো যাবে, বিপর্যয় তত কম ঘটবে। অর্থাৎ অসুখ শুরুর অবস্থাতেই তাকে নির্ণয় (ডায়াগনোসিস) এবং চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট) করা দরকার।

শুরুতে চিকিৎসা মানে ঠিক কখন?

যদিও শুরুতে চিকিৎসা করলে ভালো হয় বলছি, প্রকৃতপক্ষে ক্যান্সারের একেবারে শুরুতে তাকে ধরা এক কথায় অসম্ভব। ক্যান্সার শুরু হয় মাত্র কয়েকটি 'ক্লোনাল সেল' (clonal cell) থেকে। সেই ক্লোনাল কোষগুলি--এক থেকে দুই, দুই থেকে চার--এই পদ্ধতিতে বাড়তে বাড়তে যখন ১,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক কোষ হয়, তখন টিউমারটি মোটামুটি মাত্র ১ সেমি আয়তনের হয়, আমরা হয়তো তখন প্রথম বুঝতে পারি, তা-ও যদি তা আমাদের শরীরের একেবারে উপরের স্তরে হয়। আর শরীরের ভেতরে হলে তা আর দু-চার গুণ না বাড়লে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। ক্যান্সার তার দূষিত কোষগুলিকে আমাদের অজ্ঞাতসারেই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলিতে চালান করে দিতে থাকে। এখন এই টিউমারটি ৪ বা ৮ সেমি-র হলে আমরা ভাবি রোগটি শুরুতেই ধরা পড়ল। আসলে তা শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে।

ধরা পড়লে কীভাবে চিকিৎসা করবেন?

আমাদের দেশে কয়েক প্রকার চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে। আছে আধুনিক পশ্চিমি চিকিৎসা, যা আমাদের দেশে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নামে খ্যাত। এছাড়াও আছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ইত্যাদি। অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি সম্মান দেখিয়েও বলব, এই মুহূর্তে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অ্যালোপ্যাথি-র শরণ নেওয়াই ঠিক। অন্যান্য পদ্ধতিগুলিতে পরীক্ষামূলক কাজ চলতেই পারে, কিন্তু পশ্চিমি চিকিৎসা (অ্যালোপ্যাথি) ক্যান্সার চিকিৎসায় এখনই বেশ কিছুটা পরিণত হয়ে গিয়েছে। যদিও এই রোগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে সে-ও এখনও অক্ষম। অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতির রোগ নিরাময় ক্ষমতা নিয়ে নানাবিধ মত আছে।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা কীভাবে হয়?

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার কিছু ভাগ আছে—শল্য চিকিৎসা, রে চিকিৎসা বা রেডিওথেরাপি, ঔষধ চিকিৎসা বা কেমোথেরাপি, হরমোন চিকিৎসা, অ্যান্টিবডি চিকিৎসা।

শল্য চিকিৎসা (সার্জারি)

ক্যানসারে শল্য চিকিৎসা বড়ো ভূমিকা পালন করে। রোগ বিশেষত প্রথম অবস্থায় থাকলে, তাকে আমূল উৎপাটন করে। যদি অসুখটি ইতিমধ্যেই অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে থাকে তবে এতেই চিকিৎসা সম্পূর্ণও হতে পারে। অর্থাৎ অপারেশনের পর কোনো সহযোগী চিকিৎসা অনেক সময় যোগ করতে হয় না। শল্য চিকিৎসা প্রধান চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার হয় স্তন, মস্তিষ্ক, জরায়ু, পাকস্থলী, বৃহদন্ত্র. মলাশয়. পিত্তথলি, চোখের ক্যান্সার এবং হাত-পায়ের সারকোমা (সারকোমা) ইত্যাদিতে।

রেডিওথেরাপি (তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ চিকিৎসা)

গামা রশ্মি ব্যবহার করা হয় প্রধানত 'কোবাল্ট ৬০' নামে একটি আইসোটোপ থেকে। আর হাই এনার্জি এক্স রে (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক্স রে) ব্যবহার করা হয় 'লিনিয়ার অ্যাক্সেলেটর' নামক যন্ত্র থেকে। এই যন্ত্রটি 'কোবাল্ট ৬০'-এর তুলনায় আধুনিক, দামও অনেক বেশি, সুবিধাও। তবে সাধারণভাবে 'কোবাল্ট ৬০' দিয়েই যথেষ্ট উন্নত মানের চিকিৎসা করা সম্ভব। এই যে বিশেষ ধরনের রে-চিকিৎসার কথা বলা হল, এক কথায় এর নাম টেলিথেরাপি। মানুষের শরীর থেকে মোটামুটি ৮০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার দূর থেকে রশ্মি নির্গত হয়ে শরীরের ওপর পতিত হয়।

চিত্র ১. রেডিওথেরাপি সাধারণত বেশ জটিল ও দামি যন্ত্রনির্ভর

অন্য আর এক ধরনের চিকিৎসা আছে, যাকে বলে ব্র্যাকিথেরাপি (Brachy Therapy)। Brachy অর্থ নিকট। এই পদ্ধতিতে আইসোটোপ অর্থাৎ রশ্মির উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থকে অসুস্থ কোষগুলির একেবারে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ওই রশ্মি অসুস্থ কোষগুলিকে মেরে ফেলে, কিন্তু বেশি দূর যায় না, অর্থাৎ চারপাশের সুস্থ কোষগুলিকে বেশি আঘাত করে না। টেলিথেরাপিতে কিন্তু অসুস্থ কোষের চিকিৎসার পাশাপাশি সুস্থ কোষের ওপরেও রশ্মি পড়ে এবং সুস্থ কোষকে আঘাত করে। Brachy Therapy-তে পার্শ্ববর্তী কোষগুলির কম ক্ষতিসাধন হয়। তবে বাস্তবত ক্যানসারের চিকিৎসায় দু-ধরনের পদ্ধতিই দরকার।

ইলেকট্রন দিয়েও (উৎস 'লিনিয়ার অ্যাক্সেলেটর') ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়। রেডিওথেরাপি কখনো প্রধান চিকিৎসা, কখনো সহযোগী চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রেডিওথেরাপি কখন করতে হয়?

রেডিওথেরাপি কখনো কখনো প্রধান চিকিৎসা, আবার তা অনেক সময় অন্য চিকিৎসার সাহায্যকারী। রেডিওথেরাপি কখন প্রধান চিকিৎসা? যখন অপারেশন করে অসুস্থ অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়া যায় না, তখন রেডিওথেরাপি প্রাথমিক ও প্রধান হতে পারে। শল্য চিকিৎসায় অসুস্থ অঙ্গ/অংশটিকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। রেডিওথেরাপি কোনো অঙ্গ কেটে ফেলে না, অঙ্গটিকে অক্ষত রেখে অসুস্থ কোষগুলিকে নষ্ট করে। বস্তুত অনেক অংশই কেটে ফেলা সম্ভব নয়, তাতে মানুষের শরীরের প্রকৃতি নষ্ট হয়, জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যেমন, গলা মুখের সার্জারিতে ভয়ংকর মুখবিকৃতি হয়, শব্দ করা যায় না, অনেক সময় উচ্চারণ করাও যায় না, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যেও আলাদা নল লাগাতে হয়। মুত্রথলির (ইউরিনারি ব্লাডার) এবং মলাশয় (রেকটাম)-এর ক্যানসারে অনেক সময়ই প্রস্রাব ও পায়খানার জন্য ভিন্ন পথ তৈরি করতে হয়। এর ফলে রোগীদের সমাজে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলার অসুবিধে হয়। গলা ও মুখ এবং জরায়ুমুখ (Cervix)-এর ক্যান্সারে তাই বেশির ভাগ সময় রেডিওথেরাপির মাধ্যমেই চিকিৎসা করা হয়। এবং তার কার্যক্ষমতা শল্য চিকিৎসার পাশাপাশি সমমানের, এমনকী কখনো উন্নত মানেরও। তা ছাড়া রেডিওথেরাপিতে শরীরের অঙ্গের যেহেতু বিকৃতি হয় না, তাই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

রেডিওথেরাপি কখন সহযোগী চিকিৎসা?

অনেক সময় সার্জারিতে ক্যান্সার আক্রান্ত অঙ্গটিকে কেটে ফেলার পরেও পাশাপাশি অনেকটা অঞ্চল জুড়ে অল্পস্বল্প অসুস্থ কোষ ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে। তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। তা ছাড়া এতখানি অঞ্চল কেটে ফেললে শরীরের ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে। অথচ কোনো চিকিৎসা না করলে, কয়েক মাসের মধ্যে ওই অসুস্থ কোষগুলো বাড়তে বাড়তে বৃহদায়তন ধারণ করবে এবং নীরবে শরীরের দূরতম স্থানেও ছড়িয়ে পড়বে। একে বলে মেটাস্টাসিস। ফুসফুস (লাং), যকৃৎ (লিভার), মস্তিস্ক (ব্রেন), হাড় (বোন) হল মেটাস্টাসিসের উল্লেখযোগ্য জায়গা। আর বলা যায়, এগুলো শরীরের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই বাংলার সেই প্রবাদ—'শত্রুর শেষ রাখতে নেই'—সেই দর্শন মাথায় রেখেই সার্জারির পর অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি অঞ্চলটিতে রে দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, যাতে আর অঙ্গহানি না ঘটিয়ে অসুখটাকে নির্মূল করা যায়। স্তন, বৃহদন্ত্র, প্রোস্টেট, মূত্রথলি বা জরায়ু ক্যান্সারে সার্জারির পর সহযোগী চিকিৎসা হিসেবে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়।

চিত্র ২. কেমোথেরাপিতে সাধারণত শিরার মধ্যে (ইন্ট্রাভেনাস) ইঞ্জেকশন দিয়ে ওষুধ দেওয়া হয়

কেমোথেরাপি কী? কখন এই চিকিৎসা করা হয়?

এর অর্থ হল ক্যান্সার কোষ মারার ওষুধ দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ক্যান্সার যদি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সীমিত থাকে, তখন তাকে অপারেশন করে এবং রে দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। তবে অনেক সময় দেখা যায়, অসুখটি তার শুরুর জায়গায় বসে নেই, ইতিমধ্যে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সবসময় হয়তো সেই ছড়িয়ে পড়াটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আশঙ্কা করছি। এসব ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি ওষুধ দেওয়া হয়। কেমোথেরাপি ওষুধ

অসুখটির মতোই, শরীরের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দূরতম অসুস্থ কোষগুলোকে মেরে ফেলে। এখানেও অঙ্গহানি হয় না।

কখনো আবার হয়তো অসুখটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি, কিন্তু সীমিত স্থানেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অপারেশন এবং রেডিওথেরাপির মাধ্যমে অসুখের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয় না। কেমোথেরাপিও যোগ করা হয় মুল চিকিৎসার সঙ্গে।

কেমোথেরাপির ব্যবহারের কি রকমফের আছে?

হ্যাঁ, কেমোথেরাপির ব্যবহারের কারণ ও উদ্দেশ্য সব ক্ষেত্রে একরকম নয়। যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি হল প্রধান চিকিৎসা (প্রাইমারি কেমোথেরাপি), যেমন লিউকিমিয়া, লিম্ফোমা এসব রোগে। এ সব ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই রোগটা সারা দেহে বা অনেকটা অংশে ছড়িয়ে গেছে। লিউকিমিয়া, যাকে আমরা চলতি কথায় রক্তের ক্যান্সার বলি। সেটা তো সারা শরীরেই আছে, শল্য চিকিৎসা করে তাকে বাদ দেবার প্রশ্নই নেই, রেডিওথেরাপি করেও দেহজুড়ে ছড়িয়ে পড়া কোষগুলোকে মারা সম্ভব নয়। অতএব কেমোথেরাপিই প্রথম চিকিৎসা।

সহযোগী চিকিৎসা (অ্যাডজুভ্যান্ট কেমোথেরাপি)—অপারেশন বা রেডিওথেরাপির পর যোগ করা হয়। যেমন স্তন ক্যান্সার, মলাশয়/ বৃহদন্ত্র ক্যান্সার, কোরিওকার্সিনোমা, জার্ম সেল টিউমার ইত্যাদি।

প্রাক-সহযোগী চিকিৎসা (নিও-অ্যাডজুভ্যান্ট কেমোথেরাপি)— মূল চিকিৎসার আগে সহযোগী চিকিৎসা। গলা ও মুখের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার এবং মলাশয়/বৃহদন্ত্রের ক্যানসারের অ্যাডভ্যান্সড স্টেজ-এ ব্যবহার করা হয়।

কেমো-রেডিয়েশন—কখনো কখনো রে চিকিৎসার পাশাপাশি একই সঙ্গে কেমোথেরাপি দেওয়া হয়, এখানে কেমোথেরাপি রে চিকিৎসার কাজটাকে জোরদার করে।

ক্যান্সার চিকিৎসার অনেক সাইড এফেক্ট নিয়ে অনেক কিছু শোনা যায়। সেগুলো কি সত্যি?

হ্যাঁ, ক্যান্সার চিকিৎসার অনাকাঙ্ক্ষিত বিষক্রিয়া বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (টক্সিসিটি/সাইড এফেক্টস) অনেক আছে।

একটা দেশের সরকারকে যেমন রক্ষা করে তার প্রশাসন বিভাগ-পুলিশ-মিলিটারি, তেমনি আবার অনেক সময় রক্ষাকর্তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, অসাধুতা দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুঃসহ করে তোলে। একইরকমভাবে ওষুধের ক্রিয়ার সাথে সাথেই আসে তার বিষক্রিয়া বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

কিছু কিছু বিশেষ প্রতিক্রিয়া অনেক অসুখেই হয়--যেমন বমি অথবা বমি ভাব, গলা ও মুখে ঘা হওয়া, বোন ম্যারো ডিপ্রেশন [অস্থিমজ্জায় রক্তকণিকা তৈরি হওয়া কমে যাওয়া, ফলে রক্তে হিমোগ্লোবিন, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিকা (প্লেটলেট) কমে যাওয়া।

আবার কিছু কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিশেষ ওষুধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন—

সাইক্লোফসফামাইড ও ইফসফামাইড (Cyclophosphamide/ ifosfamide)—মূত্রথলির প্রদাহ

ফাইভ ফ্লুরোইউরাসিল (5 Fluro Uracil)— অতিরিক্ত পায়খানা

মেথোট্রেক্সেট (Methotrexate)—মুখ ও শরীরের ভেতরের ঝিল্লি (মিউকাস মেমব্রেন) উঠে ঘা হয়, রক্তকণিকা কমে যায়।

অ্যাড্রিয়ামাইসিন (Adriamycin)—হার্ট-এর পক্ষে ক্ষতিকর।

ভিনক্রিস্টিন, প্যাকলিট্যাক্সেল, ডোসেট্যাক্সেল (Vincristine, Paclitaxel, Docetaxel)—স্নায়ুর ক্ষতি করে। জেমসিটাবিন (Gemcitabine)—রক্ত কমিয়ে দেয়। যকৃতের পক্ষেও ক্ষতিকারক।

সিসপ্লাটিন (Cisplatin)—কিডনি এবং স্নায়ুর ক্ষতি করে, বমি হয়। (বেশির ভাগ সময় এই সব প্রতিক্রিয়াগুলো চিকিৎসা শেষে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।)

কেমোথেরাপির সময় তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আটকানোর জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

বমি বন্ধ করার জন্য এবং অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন প্রতিরোধের জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। যেমন অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন কমানোর জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন (Antihistamine) গোত্রের ওষুধ ও স্টেরয়েড ওষুধ ডেক্সামেথাসোন (Dexamethasone), বমি বন্ধ করার জন্য অন্ডানসেনট্রন (Ondansentron), অতিরিক্ত অ্যাসিড ক্ষরণ বা অম্বলের জন্য i ̈িনিটিডিন (Ranitidine) এই সমস্ত ওষুধ। এদের সাধারণত ইঞ্জেকশন হিসেবেই দিতে হয়।

ইফসফামাইড বা উচ্চমাত্রার সাইক্লোফসফামাইড (Ifosfamide/ High dose Cyclophosfamide)-এর পাশাপাশি Mesna ইনজেকশন দেওয়া হয়।

অ্যাড্রিয়ামাইসিন (Adriamycin)-এর পাশাপাশি Dexrazoxane বলে আর একটি ওষুধ দেওয়া যায়। তবে অ্যাড্রিয়ামাইসিন ওষুধটি সারা জীবনে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম না করলে ওই প্রতিরোধী ওষুধের দরকার হয় না।

মেথোট্রেক্সেট (Methotrexate)-এর পার্শ্বক্রিয়ার জন্য ফলিনিক অ্যাসিড ইনজেকশন।

আরেকটা ছোটো কিন্তু খুব দরকারি কথা হল, শিরায় দেবার কেমোথেরাপি দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে ওষুধ যাতে কোনো মতেই শিরার বাইরে চামড়ার তলায় চলে না যায়। এ রকম হলে ওই অঞ্চলের চামড়া একেবারে উঠেই যেতে পারে। অবশ্য কেমোথেরাপি সবসময় শিরায় দেবার (intravenous) হবে এমন নয়, পেশিতে (Intramuscular injection) -ও হতে পারে। এছাড়া মুখে খাওয়ার কেমোথেরাপি ওষুধও আছে।

টার্গেটেড থেরাপি বলে একটা কথা শোনা যায়। সেটা কী?

আমরা দেখলাম, কেমোথেরাপি যেমন ক্যান্সার কোষের ওপর কাজ

চিত্র ৩. টার্গেটেড থেরাপি

করে, তেমনই স্বাভাবিক সুস্থ কোষের ওপরেও তার ক্ষতিকারক প্রভাব থাকে। সেই জন্যই নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

টার্গেটেড থেরাপি এক নবতম চিকিৎসা, যা বিশেষভাবে শুধুমাত্র ক্যান্সার কোষগুলোর ওপরেই কাজ করে। সুস্থ কোষকে আক্রমণ করে না। ফলত, ওই ওষুধগুলোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে কম, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কেমোথেরাপির চেয়ে বেশি কার্যকর। ক্যান্সার কোষের পর্দা বা ভেতরে কিছু বিশেষ অ্যান্টিজেন থাকে। ওই বিশেষ অ্যান্টিজেনই ক্যান্সার কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনে সাহায্য করে। বা ক্যান্সার কোষের স্বাভাবিক মৃত্যুতে (Apoptosis) বাধা দেয়। ফলে ক্যান্সারটি কেবল বাড়তেই থাকে। টার্গেটেড থেরাপি এক প্রকার অ্যান্টিবডি যা ওই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে প্রতিহত করে। ফলে ক্যান্সার আর বাড়তে পারে না। এই টার্গেটেড থেরাপি আবার দু-ধরনের।

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি (Monoclonal Antibody)—ক্যান্সার কোষের পর্দায় যে অ্যান্টিজেন থাকে, তার ওপর কাজ করে।

স্মল মলিকিউল অ্যান্টিবডি (Small Molecule Antibody)—কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত অ্যান্টিজেনের ওপর কাজ করে।

কয়েকটি উদাহরণ:

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি	**অসুখের নাম**
Cetuximab	ফুসফুসের ক্যান্সার বিশেষ
Trastuzumab	স্তন ক্যান্সার
Rituximab	লিম্ফোমা
Bevacizumab	বৃহদন্ত্র, ফুসফুস, গলা ও মুখের ক্যান্সার

স্মল মলিকিউল অ্যান্টিবডি	অসুখের নাম
Gefitinib	ফুসফুসের ক্যান্সার
Lapatinib	স্তন ক্যান্সার
Imatinib	ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া ও GIST
Desatinib	ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া
Sunitinib/Sorafenib	কিডনি ক্যান্সার

বিশেষভাবে উল্লেখ প্রয়োজন, ফুসফুস, রক্ত, স্তন বা বৃহদন্ত্র—এদের যেকোনো ক্যান্সারে এই টার্গেটেড অ্যান্টিবডি কিন্তু কাজ করবে না। ওই বিশেষ অ্যান্টিজেন যদি ক্যান্সারটিতে থাকে, তবেই ওই অ্যান্টিবডি তাকে প্রতিহত করে অসুখটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

আর একটা কথা, স্মল মলিকিউল অ্যান্টিবডি, অর্থাৎ যেগুলো nib দিয়ে শেষ, সেগুলো ইনজেকশন নয়, মুখে খেতে হয়। সুতরাং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝামেলাটাও এড়ানো যায়।

হরমোন থেরাপি

শরীরের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে কিছু ক্যান্সার হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাইরে থেকে হরমোন দিয়ে ওই হরমোনের চিকিৎসা করা হয়। যেমন স্তন ক্যান্সার। প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা হয় ওই ক্যান্সার হরমোনে সাড়া দেবে কি না। সেটা বোঝার জন্য ক্যান্সার কোষ থেকে Estrogen Progesterone Receptor Detection করা হয়। যদি এই টেস্টের ফল ইতিবাচক (positive) হয়, তবে Antioestrogen দেওয়া হয়।

প্রস্টেট ক্যানসারে মূলত সহযোগী চিকিৎসা হিসেবে হরমোন চিকিৎসা দেওয়া হয়। যেমন

১. Orchiectomy: অণ্ডকোষ দু-টি কেটে দিলেই তার থেকে 5 Hydroxy Testosterone তৈরি বন্ধ হয়।

২. LH-RH: অনেক রোগী অণ্ডকোষ কেটে দেওয়া মেনে নিতে পারেন না। তাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত চিকিৎসা LH-RH Injection। মাসে এক বার থেকে তিন মাসে এক বার দেওয়া হয়। এই ওষুধটির দাম কয়েক হাজার টাকা।

৩. Anti Androgen: প্রয়োজনে উপরোক্ত চিকিৎসার সঙ্গেই Flutamide/Bicalutamide যোগ করা হয়।

জরায়ুর (Uterus) ক্যান্সারে Medroxy Progesterone Acetate নামক হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। থাইরয়েডের ক্যানসারে সার্জারি ও রেডিওথেরাপির পর শরীরের প্রয়োজনীয় হরমোন থাইরক্সিন-এর অভাব পড়ে। তখন TSH নামে একপ্রকার হরমোন মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এই হরমোন আবার থাইরয়েড ক্যান্সারকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তাই বাইরে থেকে থাইরক্সিন জাতীয় হরমোন দেওয়া দরকার, যা অতিরিক্ত TSH নিঃসরণে বাধা দেয়।

চিকিৎসায় প্রতি দিন পরিবর্তন ঘটছে। পুরোনো ধারণা বদলে নতুন ধারণা আসছে। চিকিৎসাপদ্ধতিরও তাই পরিবর্তন ঘটছে। সাধারণের অবগতির জন্য সামান্য কথায় কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। প্রয়োজনে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. প্রদীপকুমার মাইতি, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ও রেডিওথেরাপি বিভাগের প্রধান।

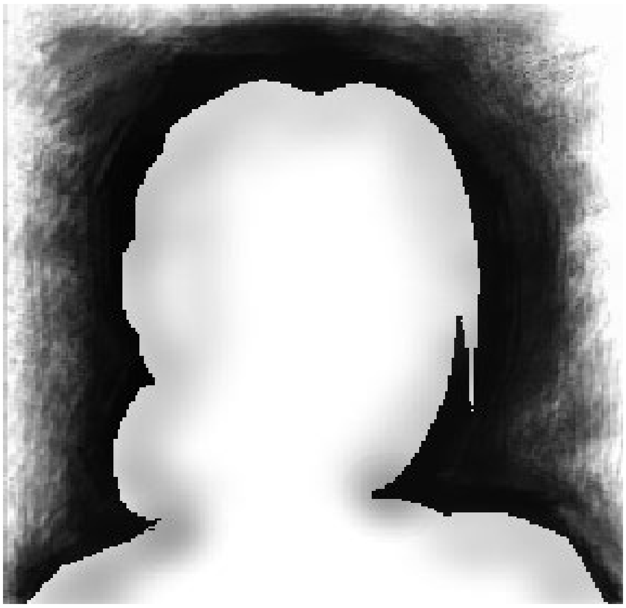

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া (Pre-eclampsia) ও তার প্রতিকার

শারীরিক নানাবিধ রোগব্যাধির সমস্যার সাথে মহিলাদের উপরি পাওনা ঋতুচক্রজনিত শারীরিক সমস্যা এবং গর্ভাবস্থাজনিত শারীরিক সমস্যা। ৪২ সপ্তাহের গর্ভাবস্থা, ৪২ রকম শারীরিক উপসর্গ। কোনোটি মন্দ, কোনোটি মন্দ নয়—লিখছেন **ডা. অনিন্দিতা**।

গর্ভাবস্থায় নানা শারীরিক উপসর্গের মধ্যে কোনটা চিন্তার বিষয় আর কোনটা সামান্য ব্যাপার, হবু মায়েদের তা জানা থাকে না। কিন্তু মন জুড়ে চলে এক অজানা আশঙ্কার থরথরানি। সব কিছু জানা-বোঝা ছাড়াই গর্ভবতী মহিলার দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। নবজাতক ছেলে না মেয়ে হবে তা নিয়ে চিন্তিত থাকে আত্মীয়-পরিজন, পরিবার। মায়েরও মন জুড়ে চলে নবজাতকের সুস্থ ও স্বাভাবিক জন্মের কামনা। মায়ের শারীরিক সমস্যার চিন্তার কথা বিশেষ কারও মাথায় থাকে না।

সুতরাং জানিয়ে রাখা ভালো, ২০১৫ এর শেষাশেষি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট পেশ হয় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে। এবং তাতে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী:

১. ভারতবর্ষে প্রতি ঘণ্টায় ৫ জন গর্ভবতী মহিলা প্রাণ হারান।

২. সারা বিশ্বের যত গর্ভবতী মহিলার মৃত্যু হয় তার ১৭ % মৃত্যু হয় ভারতে।

একজন গর্ভবতী মহিলার মৃত্যু অর্থাৎ একই সাথে দুটি প্রাণের মৃত্যু। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮৭ সাল থেকে মাতৃস্বাস্থ্যকে মানবাধিকারের একটি বিষয় হিসাবে দাবি করেছে। এবং মাতৃমৃত্যুকে শুধু সেই সমাজের স্বাস্থ্যের অবনতির সূচক হিসাবে দেখা হয় তাই নয়, সামাজিক অবক্ষয়ের সূচক হিসাবেও দেখা হয়।

মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে সরকারি পদক্ষেপগুলোর সফলতা ও ব্যর্থতা পূর্বের পরিসংখ্যানে অনায়াসেই ধরা পড়েছে। এবার পড়ে থাকে আমার আপনার সচেতন প্রয়াসের করণীয় পদক্ষেপগুলি, যার মাধ্যমে সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে মা ও শিশুকে ফেরানো যায়। প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া (pre-eclampsia) হল সেরকম একটি গর্ভাবস্থাজনিত শারীরিক সমস্যা যার ফলে প্রতি ১০০ জনে ১০ জনের মৃত্যু হয়। সঠিক সময়ে এই সমস্যার চিকিৎসা শুরু করা গেলে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুর মৃত্যু আটকানোও সম্ভব হয়।

সাবিয়া বেগম। বয়স ২১। বাড়ি বাগবাজার। দুটি ছেলে। ছোটো ছেলের বয়স ৩ বছর। তৃতীয়বারের জন্য গর্ভবতী হয়েছেন আবার। এখন ২৮ সপ্তাহ চলছে। গর্ভের ১৬ সপ্তাহ থেকে মেডিক্যাল কলেজে দেখান। গত এক সপ্তাহ থেকে দুটো পা ফুলছে। তাই দেখাতে এসেছেন আবার মেডিক্যাল কলেজে। কী হল সাবিয়া বেগমের?

পা ফোলা সাধারণ স্বাভাবিক গর্ভাবস্থারও একটি লক্ষণ। পেটের মধ্যে বাচ্চা বড়ো হতে থাকলে গর্ভাশয় ভারী হয় এবং নিম্নমহাশিরার উপর চাপ সৃষ্টি করে। পায়ের শিরাগুলি পা থেকে রক্ত নিয়ে নিম্নমহাশিরাতে ঢালে, তারপর সেই রক্ত মহাধমনি হয়ে হৃদ্‌যন্ত্রে ফেরত যায়। নিম্নমহাশিরার উপর বড়ো গর্ভাশয় চাপ দিলে সেখানে রক্ত চলাচল কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে পায়ের রক্ত বিনা বাধায় ফেরত যেতে পারে না। পায়ের শিরায় অতিরিক্ত রক্ত জমে, আর তার ফলে পায়ের রক্তজালকের মধ্যে রক্তের চাপ বাড়ে। ছোটো ছোটো রক্তজালক কিন্তু ঠিক লোহার পাইপের মতো সলিড নয়, খানিকটা সছিদ্র। চাপ বাড়লে সেখান থেকে রক্তরস বেরিয়ে পায়ের নরম অংশে, চামড়ার নীচে, জড়ো হয়। আমরা তখন দেখি যে পা ফুলছে।

সাধারণত শুয়ে বিশ্রাম নিলে বা পায়ের নীচে বালিশ রেখে শুয়ে থাকলে আস্তে আস্তে ফোলাভাব কমে যায়। কিন্তু যদি পায়ের ফোলাভাব ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার পরেও না যায় তাহলে পা ফোলার জন্য ডাক্তারি পরামর্শের প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে পা ফোলার কারণ প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া হতে পারে।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া কী?

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া হল দুই বা ততোধিক শরীর তন্ত্রের সমস্যা; যার ফলে, গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর থেকে একজন স্বাভাবিক রক্তচাপযুক্ত মহিলার দেহে:

☞ রক্তের চাপ ১৪০/৯০ বা তার বেশি হয়।

☞ মূত্রে প্রোটিনের পরিমাণ

☞ ২৪ ঘণ্টার মূত্রে ০.৩ গ্রাম বা তার বেশি হয়,

☞ ৪ ঘন্টা অন্তর পরপর দু-বার নেওয়া মূত্রের নমুনায় প্রোটিনের পরিমাণ ০.১ গ্রাম প্রতি লিটার বা তার বেশি হয়।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়ার উপসর্গগুলি কী কী?

➢ দুই পা ফোলা, যা পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরেও থেকে যায়। এটিই প্রাথমিক উপসর্গ।

এছাড়া কিছু উপসর্গ থাকতেও পারে, বিশেষ করে যখন রোগ বেশি গুরুতর হচ্ছে। সেগুলো হল:

➢ মাথাব্যথা

➢ ঘুমের সমস্যা

➢ মূত্রের পরিমাণ কমে যাওয়া।

➢ পেটে ব্যথা ও বাদামি রং-এর বমি।

➢ চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া,

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়ার লক্ষণগুলি কী কী?

❖ অস্বাভাবিক ওজনবৃদ্ধি—১ সপ্তাহে ০.৪৫ কেজি বা ১ মাসে ২.২ কেজি বা তার বেশি ওজন বৃদ্ধি।

❖ রক্তচাপ বৃদ্ধি—১৪০/৯০ বা তার বেশি। সাধারণত ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ প্রথমে বাড়ে।

❖ পা ফোলা।

❖ ফুসফুসে জল জমা।

❖ পেটের মধ্যে অ্যামনিয়োটিক তরলের পরিমাণ হ্রাস।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়ায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ

✠ মূত্রের সাধারণ পরীক্ষা

✠ চোখ পরীক্ষা বা অপথ্যালমোস্কোপি

✠ মা সাধারণত পেটের মধ্যে বাচ্চার নড়াচড়া বুঝতে পারেন। প্রতি ১২ ঘণ্টায় বাচ্চার নড়াচড়া ১০ বারের বেশি বুঝতে পারা হল স্বাভাবিক। তার কম হলে বা কিছু না বুঝতে পারলে চিকিৎসক পেটে হাত দিয়ে নাড়াচড়া বুঝতে পারেন, স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বাচ্চার হৃৎস্পন্দন শুনতে পারেন। এভাবে বাচ্চার অবস্থা বোঝা না গেলে ও হৃৎস্পন্দন শোনা না গেলে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা দরকার।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়ার জটিলতা

☞ ইক্ল্যাম্পসিয়া eclampsia অর্থাৎ প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া ও তার সাথে খিঁচুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

☞ আকস্মিক রক্তক্ষরণ

☞ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ও অন্ধত্ব

☞ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ

☞ সময়ের আগে প্রসব বেদনা

☞ হঠাৎ শ্বাসকষ্ট

☞ বাচ্চার জন্মের পর রক্তক্ষরণ

☞ অভিঘাত বা শক

☞ সেপসিস

☞ গর্ভে বাচ্চার মৃত্যু

☞ গর্ভে বাচ্চার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া

☞ সময়ের আগে বাচ্চার জন্ম

☞ গর্ভে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া

চিকিৎসায় প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া রোগী কতটা তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে তা নির্ভর করে রোগের প্রাবল্য, গর্ভের কত সপ্তাহ থেকে রোগের আবির্ভাব এবং কখন চিকিৎসা শুরু করা হচ্ছে তার উপর।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়ায় গর্ভবতী মহিলাদের কীভাবে নজরে রাখা উচিত

➢ ক্ষতিকর উপসর্গগুলো গর্ভবতী মহিলার দেহে দেখা দিচ্ছে কিনা নজর রাখা, যেমন মাথাব্যথা, চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস।

➢ প্রতিদিন দেহের ওজন মাপা ও নথিবদ্ধ করা এবং পায়ের ফোলাভাব এর বাড়া-কমা লক্ষ রাখা।

➢ দিনে কত পরিমাণে জল ও তরল খাদ্য খাওয়া হচ্ছে এবং কতটা পরিমাণে মূত্র রূপে দেহের বাইরে যাচ্ছে তার সঠিক হিসেব রাখা—সাধারণত যতটা জল ও তরল পদার্থ গ্রহণ করা হয় আর তার সমপরিমাণ মূত্র উৎপন্ন হওয়া উচিত।

➢ দিনে ৪ বার ৬ ঘণ্টা অন্তর রক্তচাপ মাপা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

➢ বাচ্চা পেটের মধ্যে সুস্থ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা (মা বাচ্চার নড়াচড়া ১২ ঘণ্টার মধ্যে ১০ বারের বেশি করছে বুঝতে পারলে বাচ্চা সুস্থ আছে ধরা হয়।)।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়ায় গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কিছু জানার কথা

❖ বিশ্রাম নেওয়ার সময় বাঁ-দিক কাত হয়ে শোয়া উচিত।

তাতে পায়ের ফোলাভাব কম হয়।

❖ প্রতিদিন ১০০ গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত।

❖ রক্তচাপ কমানোর ওষুধ ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। রক্তচাপ হ্রাসকারী ল্যাবিটলল ওষুধটি বেশি ব্যবহার করা হয়। সবরকম রক্তচাপ কমানোর ওষুধ ব্যবহার করা যায় না।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়ায় মূল চিকিৎসা কিন্তু বাচ্চা প্রসব। সাধারণত ৩৭ সপ্তাহ পর প্রসব বেদনা না উঠলেও সিজার করে বা বাইরে থেকে ওষুধ প্রয়োগে বাচ্চা প্রসব করানো হয়। বাচ্চা প্রসবকালীন সময়ে রক্তচাপ ও মূত্রের পরিমাণ সঠিক রাখার দিকে লক্ষ রাখতে হয়। এবং বাচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত মা-কে তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। রক্তচাপ পরিমাপ করা হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর। রক্তচাপ বেশি থাকলে নির্দিষ্ট রক্তচাপহ্রাসকারী ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া প্রতিরোধের উপায়

➤ গর্ভাবস্থার নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা--ন্যূনতম চারবার। প্রথমবার গর্ভসঞ্চারের ১৬ সপ্তাহে, দ্বিতীয়বার ২৪ থেকে ২৮ সপ্তাহের মধ্যে, তৃতীয়বার ৩২ সপ্তাহে এবং চতুর্থবার ৩৬ সপ্তাহে।

➤ ভিটামিন E ও ভিটামিন C সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফল খাওয়া। যেমন— লেবু, পেয়ারা।

➤ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।

➤ গর্ভবতী মহিলার প্রসব সবসময় কোনো চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানেই করানো।

প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপটি সাবিয়া বেগম ও তার পরিবার নিয়েছিলেন—তা ছিল নিয়মিত মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার দেখাতে আসা। তাই সাবিয়া বেগম-এর প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া ধরা পড়লেও বাচ্চার প্রসব মেডিক্যাল কলেজে নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা ও পরামর্শ সহযোগে হওয়ার ফলে তিনি প্রসব পরবর্তীকালে সুস্থ শরীরে সুস্থ নবজাতককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে যান।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য: গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ডাক্তার দেখানো প্রিইক্ল্যাম্পসিয়া ও তার মতো আরও নানা গর্ভকালীন জটিলতাগুলি প্রতিরোধ সম্পর্কে সকলে প্রাথমিকভাবে যাতে সচেতন হয়ে উঠতে পারে, তারই একটা প্রয়াস। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনিন্দিতা, এমবিবিএস, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের হাউসস্টাফ।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিউ

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজ স্ট্রিট, কফিহাউস (তৃতীয় তল),
কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

নবম পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

'ডা. হৈমবতী সেন-এর(১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে' পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

উপহারের টাকায় থালা উপচে পড়ছে। রাত্রি ন-টার সময় বাবা আমাদের অন্দরমহলে ফিরে যেতে বললেন। গোটা বাড়ি আলোয় ঝলমল করছিল। আমি কনেকে নিয়ে অন্দরমহলে গেলাম। পরদিন সকালে ফের ওকে নিয়ে সেরেস্তার বৈঠকখানায় গেলাম। সেদিনও তারা টাকা উপহার নিয়ে এসেছিল। আমি শুনেছিলাম আগের দিন কনে পেয়েছিল ৩০০০ টাকা আর আমি ১৫০০ টাকা। পরের দিন মাত্র ৪০০-৫০০ টাকা উঠেছিল। এই টাকা আমাদের জন্যে জমা করে রাখা হল। বোঝাপড়াটা এই রকম: আমরা যখন চাইব তখনই টাকা পাব। আমি প্রজাদের বললাম: 'আপনারা এখুনি চলে যাবেন না, আমি নিজহাতে আপনাদের রান্না করে খাওয়াব।' ওঁরা বললেন যে ওইসময়ে ওঁদের থাকার কোনো উপায় নেই তবে পরে নেমন্তন্ন পেলে ওঁরা নিশ্চয়ই আসবেন। আমি ওঁদের সবার ঠিকানা নিয়ে নিলাম। আমার খাটনি বলতে গাঁয়ের মোড়লকে একটা চিঠি লেখা। তাহলেই গাঁয়ের সকলে নেমন্তন্নের কথা জেনে যাবে। সকলেই খুব খুশি মনে বিদায় নিলেন। আমাদের জমিদারির কয়েকটা মাত্র গ্রাম থেকেই প্রজারা এসেছিলেন—দেবীতলা, বরণপাড়া, জাবড়া, বকুলতলা আর বড়ভুঁইয়া-এর মতো কিছু গাঁ, যেগুলোর নাম আমার মনে নেই। এই প্রজারা এত নম্র, ভদ্র, শান্ত স্বভাবের! ওঁদের আচার-ব্যবহার সত্যি মন ভালো করে দেয়। উৎসবের ঘটা চলল বেশ কয়েকদিন ধরে। অবশেষে নহবতের বাজনা থেমে গেল। আত্মীয়-স্বজন আমন্ত্রিতরা সব চলে গেলেন। ঠিক হল, এবার আমার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।

বাবা বললেন: 'তুমি কি তোমার টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও?' আমি বললাম: 'কোথায় রাখব আমি টাকা-পয়সা? তুমি বরং ওটা মাকে দিয়ে দাও। তিনি টাকাটা নিজের কাছে রাখবেন আর মাসে মাসে কিছু কিছু করে আমাকে পাঠাবেন।' সবাই মেনে নিল, এটাই সবথেকে ভালো বন্দোবস্ত। আমি শালকিয়ার দিকে রওনা দিলাম। আমার শাশুড়ি তখন সেখানে; তাঁর বড়ো বউমা তখন সন্তানসম্ভবা এবং শাশুড়ি মাগুড়ায় যাবেন কেননা ওখানে আশীর্বাদী অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাই ঘটল, আমরা মাগুড়া গেলাম, ওখানে আশীর্বাদী অনুষ্ঠান হল। তিনি ঠিক করলেন যে এখানেই থেকে যাবেন। ওখানে থেকে খবর পেলেন মেজদি অসুস্থ, সেই জন্যে আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি খুলনায় অনেকদিন ছিলাম।

বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে গেলাম। বাবার নিদারুণ কাহিল দশা দেখে আমি প্রায় ভেঙে পড়লাম। বললাম: 'বাবা, আমি এখানে থাকি, তোমার সেবাযত্ন করি।' বাবা মানা করলেন, বললেন: 'তুমি এখানে থাকলে ঝামেলা পেকে উঠবে।

এই ক-টা দিনে তোমার মা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাড়মাস কালি করে দিয়েছেন। এসব দেখলে পরে তুমি সইতে পারবে না।' এসব শুনে আমার মাথার ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বাবার রোগের দুঃখকষ্ট আমার মর্মপীড়া যেন বাড়িয়ে দিল শত গুণ। রান্নাবান্না করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন মা; বাবার শুশ্রূষা, সেবাযত্ন করার কোনো সময়ও তাঁর ছিল না, কেননা তখন তিনি সন্তানসম্ভবা। বড়ো ভাইটা চাঁইবাসায় শ্বশুরবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। ছোটো ভাইটা কখনো এ-শরিক কখনো ও-শরিকের ঘর থেকে দু-বেলার খাবার জুটিয়ে নেয়। বাবার নিজের জন্যেও মাঝেমধ্যে খাবার আসত মন্দির থেকে; কখনো তাও জুটত না, তাঁকে না-খেয়েই থাকতে হত।

একে বাবা রোগে বিছানা নিয়েছেন তায় দিনের পর দিন না খেয়ে তাঁর দশা ক্রমেই বেশিবেশি করে কাহিল হয়ে পড়ছিল। দুঃখ-জ্বালা-রাগে আমার মনটা কেমন যেন করছিল। আমি মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিলাম। মা চিৎকার করে আমাকে গালিগালাজ করতে লাগলেন: 'তুই এক্ষুনি এখান থেকে চলে যা। কোন মুখে এখানে পড়ে আছিস তুই? নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার! এখানে তোর কোনো কথাই খাটবে না। আমার যে এ অবস্থা, আমার দিকে কোনো নজর আছে তোর?' মুখের আগল খুলে মা আমাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে যেতেই লাগলেন, থামাথামির কোনো লক্ষণই নেই। বাবাকে বলতে তিনি বললেন: 'ওকে বলতে গেলে কেন? ও আমার সঙ্গে সবসময় খারাপ ব্যাভার করে। তুমি কি ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে? তার থেকে ভালো তুমি খুলনায় চলে যাও। মরে যাওয়ার আগে আমি তোমার একটা সুরাহা করে যাব। পঞ্চাশ বিঘা জমি আমি তোমার নামে উইল করে দিয়েছি; তোমার গচ্ছিত নগদ ২০০০ টাকা তোমার মা খাটাচ্ছে; আর তোমার যা গয়নাগাটি আছে—সব মিলিয়ে তোমার ভরণপোষণ বেশ ভালোই চলে যাবে।' আমি জিগেস করলাম: 'কিন্তু মা কি আমায় টাকাটা দেবেন?' তিনি বললেন: 'দেবে না মানে? আলবাত দেবে।' এ-কথায় আমি কেঁদে ভাসালাম, বললাম: 'বাবা, তুমি বরং তোমার ঠিকমতো চিকিৎসা করার একটা বন্দোবস্ত করো। আমার কোনোকিছুই চাই না।' মায়ের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না কেননা তাঁর বাচ্চা হবে। এই দু-জনকে এ-অবস্থায় ফেলে রেখেই আমাকে খুলনায় ফিরে যেতে হবে, কেননা শ্বশুরবাড়ি থেকে এত্তেলা এলে সে-কথাকে ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় তো নেই কোনো।

খুলনায় পৌঁছেই আমি মাগুরায় চলে গেলাম। সেখানে বড়দির (বড়ো-জা) একটি ছেলে হয়েছে। শাশুড়ির তাদেরকে নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা। আমরা সকলে মিলেই ফিরলাম। বড়দি সেখানে কিছুদিন রইলেন, তারপর শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেলেন।

বাবা আমাকে মাসে মাসে ১০ টাকা করে পাঠাতেন। এর আগেও তিনি দু-বার পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি পাইনি। মজুমদার মশাই টাকাটা শাশুড়ির হাতে তুলে দিতেন, কিন্তু আমার কাছে তার কোনো খবরই ছিল না। এবারও, আশু মিত্র আর মজুমদার মশাই টাকাটা শাশুড়িকে দিলেন। তিনি সেটা নিজের কাছে রেখে দিলেন। আমার কাছে খরচ করার মতো কানাকড়িও নেই। কিন্তু এসব নিয়ে কি কিছু বলা যায়? বাপের বাড়ি থেকে যে সামান্য কিছু নিয়ে এসেছিলাম তাই টিপে টিপে খরচ করছিলাম। ওই সময়টাতে খাওয়ার জোটানো খুবই মুশকিল। বেশিরভাগ সময়ই আমাকে বিধবাদের নিরামিষ খেয়ে থাকতে হত—কড়াইশুঁটির ঝোল, থোড় নয়তো এঁচোড় আর কাঁচা তেঁতুলের অম্বল। রোজ একঘেয়ে খাবার খেতে খেতে আমার জিভের রুচিই যেন হারিয়ে গিয়েছিল। হাটবারে কিছু পুঁটি মাছ কেনা হত আর বামা-ঝি রোজ নদীতে খালুই ফেলে কুঁচো চিংড়ি ধরত। এগুলোর সঙ্গে থোড় অথবা এঁচোড় দিয়ে রাঁধা পদই আমাদের খাবার। পুকুরে এত মাছ, কিন্তু কোনোদিনই তা ধরা হত না। কেবল কর্তারা যখন বাড়ি ফিরতেন তখনই পুকুরে জাল ফেলার তোড়জোড় শুরু হত। রান্নার জন্যে রোজ দু-সের সরষের তেল কেনা হত। কিন্তু রান্নার জন্যে দেওয়া হত ছোট্ট এক বাটি তেল—তাতে কয়েক পলাও ধরে কিনা সন্দেহ। ওইটুকু তেল দিয়ে কি সব পদ রান্না করা যায়? বড়জোর এক পদ—তাতে হয়তো ওই তেলে কুলিয়ে যায়। বাকি তেলটা একটা বড়ো তেলের পাত্রে ঢেলে গোপন-ভাঁড়ারে মজুত রাখা হত। আমি ভেবেই পেতাম না অত তেল জমিয়ে রেখে হবেটা কী? গিন্নি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘাটে যেতেন স্নান করতে, সেই ফাঁকে আমরা চুপিচুপি গিয়ে আধ-সেরটাক তেল সরিয়ে ফেলতাম। কী করব আমরা? রোজ তিরিশ-চল্লিশ জনের রান্না ওই ছোটো এক বাটি মাপের তেলে হয় কখনো? ভাঁড়ারে থরে থরে কলসিভরা ডাল সাজানো—মুগ, অড়হর, ভাজা কলাই। অথচ গিন্নি আমাদের কোনোদিনই সেসব ডাল রাঁধতে দিতেন না। রোজ একঘেয়েভাবে ওই বিস্বাদ মটর নয়তো খেঁসারির ডাল গিলতে হত। কোনো পড়শি যদি এসে একটু স্বাদু ডাল চাইত, তাদের দেওয়া হত, কিন্তু আমাদের কক্ষনো না। এরকম কড়া নিয়মের বাঁধনে কেউ কি টিকে থাকতে পারে? আমরাও সুযোগ পেলেই চুরি করতে শুরু করলাম। কাউকে হয়তো ডাল দিতে বলা হল। তাকে ডাল দেওয়ার ফাঁকে আমরা নিজেদের জন্যে কিছুটা সরিয়ে রাখতাম। হরেকরকম খাবার-দাবার আর ভাজাভুজি রেঁধে ভাঁড়ারে মজুত করা হত: নারকেল নাড়ু, নারকেল তক্তি, ক্ষীরের নাড়ু, মুড়কি, চিঁড়ের মোয়া, মুড়ির মোয়া, ছাতুর নাড়ু, ঝালের নাড়ু আরও কত কী। ভাঁড়ারে তালমিছরিও মজুত থাকত। ওটা সন্দেশের থেকেও খেতে ভালো। রাক্ষস আশু মিত্রটা রোজ চুরি করে ওই তালমিছরি খেত। আমাদের কপালে জুটত কেবল জলে-ভেজানো ছোলা আর এক চিমটে আখিগুড়। শাশুড়ি একদিন দেখতে পেলেন ভাঁড়ারের তালমিছরি সব সাবাড়। তিনি খুবই রেগে গেলেন। মওকা পেয়ে আমরা ওঁর কাছে আশুতোষের কীর্তি ফাঁস করে দিলাম।

আশুতোষ যেই তালমিছরি চুরি করার দোষ স্বীকার করে নিল, আমাদের আর পায় কে। আমরাও টুকটাক তালমিছরি হাতাতে লাগলাম। এই সবকিছুই আমরাই খেটেখুটে নিজের হাতে বানাই, অথচ খাওয়ার বেলায় শাশুড়ি ঠিক করে দেন—কে খাবে আর কে

খাবে না। আশুকে তিনি কখনোই কড়া গলায় ধমকধামক দিতেন না; মা-মরা ছেলেটাকে নিজের হাতে মানুষ করেছেন কিনা! লাই পেয়ে পেয়ে ও একেবারে মাথায় চড়ে বসেছিল। এমন ভাবসাব করত যেন ও শাশুড়ির নিজের ছেলে। শাশুড়ি যখন যেখানে যেতেন, ও ঠিক তাঁর পেছন-পেছন সেখানে হাজির হয়ে যেত। ও ছিল একটা লোভী রাক্ষস। আমার জীবনে ওর মতো দ্বিতীয়টি আমি আর দেখিনি। ওকে যদি তুমি খেতে দাও ও তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। তোমার সব কাজ করে দেবে। লেখাপড়া কিছুই শেখেনি, ক-অক্ষর গোমাংস। সারাদিন কাজ বলতে বাড়িতে ঠায় বসে থাকা নয়তো ওর খুড়িমার পেছন-পেছন ঘুরঘুর করা। বিয়ে ওর একটা হয়েছিল বটে কিন্তু ওর বউকে যে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসতে হয়—সেকথা এ-বাড়ির কারোর মাথাতেই আসেনি। সৎমার কোন দায় পড়েছে বউকে শ্বশুরবাড়িতে আনার?

ওর বউকে বাপের বাড়িতে ফেলে রাখার আরও একটা কারণ ছিল। ওর সঙ্গে মৃণালের মায়ের একটা গোপন অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সেজন্যেই আশু বউকে নিয়ে আসার জন্যে তেমন গা করত না। শেষমেশ শাশুড়ি বউকে নিয়ে এলেন ও আশুতোষকে বাধ্য করলেন বউ-এর সঙ্গে থাকতে। মৃণালের মায়ের সঙ্গে আশুর খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। আশুর কবল থেকে ছাড়া পেয়ে মৃণালের মা এবার খোলা মনে অন্য কোনো বন্দোবস্তর দিকে ঝুঁকলেন। অবশ্য সেটা যে কী, তা আমি জানি না।

আশুর বউ বেশ কিছুদিন ছিল। আমার বড়ো ভাশুর তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেন। তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় মারা গিয়েছেন; রেখে গিয়েছেন একমাসের একটি মেয়ে আর দু-বছরের ছেলে অতুলকে। আমার কাজ হল তাদের মায়ের জায়গা নেওয়া—তাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো, মোট কথা তাদের পুরো দেখভাল করা। শাশুড়ি বড়ো বউমার অসুখের খবর পেয়ে বড়ো ছেলের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে আমি ছিলাম আমার পিসিশাশুড়ির সঙ্গে। অবশেষে সব ছেলেরা (আমার ভাশুর দেওররা) পরিবার-পরিজন নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। অন্যরা একে একে চলে গেলেও রয়ে গেলেন বড়ো ভাশুর আর আমার ছোটো খুড়শ্বশুর তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে। এত লোকজনের সংসারে রোজকার কাজের হ্যাঁপা সামলানো কঠিন হয়ে উঠল বই কী। বড়দি (বড়ো জা), মতুর মা একা হাতেই সব রান্নাবান্না সারতেন। কোনো কোনো দিন আমিও হাত লাগাতাম। ছোটো খুড়শাশুড়ি কুটোটি নাড়তেন না। ওঁর সঙ্গে কারোরই পটত না তেমন। একদিন তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচি; আমরা ভাবলাম কী-না-কী হল বুঝি! ভয়ে শিঁটিয়ে রইলাম। কিছু পরে মৃণালের মায়ের গলা শোনা গেল। আশুতোষ দরজা খোলার জন্যে জোরাজুরি করছিল আর মৃণালের মা কিছুতেই সেই দরজা খুলতে দেবে না। খানিক ধস্তাধস্তির পর দু-তিনটে লোক জোর করে দরজা ভেঙে মৃণালের ঘরে ঢুকে বড়ো কুলুঙ্গি থেকে একটা লোককে হিড়হিড় করে টেনে বার করে আনল। ওঃ! কী মারটাই না খেল লোকটা! তারপর ওকে যখন ওরা দড়ি দিয়ে বাঁধছিল, মনে হচ্ছিল যেন একটা লাশকে বাঁধছে।

শাশুড়ি তখন শুয়েছিলেন। মৃণালের মা দৌড়ে এসে শাশুড়ির পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে লাগল। বলল: 'একটা লোক আমার কাছে টাকা ধার নিতে এসেছিল। লোকটাকে ওরা ধরে ফেলে আর এখন বেধড়ক পিটুনি দিচ্ছে। আমার নামে এমন বিচ্ছিরি সব আকথা-কুকথা বলছে, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।' শাশুড়ি জিগেস করলেন: 'কারা করছে এসব?' মৃণালের মা জবাব দিলেন: 'আশু মিত্রর লোকজন।' শাশুড়ি ওর কথা বিশ্বাস করলেন এবং চিৎকার করে ডাকলেন: 'এই হরমোহন!' আমার খুড়শ্বশুর তাঁর সামনে এসে হাজির। তিনি ফের গর্জে উঠলেন: 'এসব হচ্ছেটা কী? তোমরা কী সবাই মিলে ঠিকই করে ফেলেছ যে এই পরিবারের কষ্টার্জিত সুনাম ধুলোয় মিশিয়ে দেবে?' খুড়শ্বশুর খানিকটা থতোমতো খেয়ে বললেন: 'আশু আর তার লোকজনেরা কী করছে না করছে, আমি তো তার বিন্দুবিসর্গও জানি না। তবে ওরা মৃণালের মায়ের ঘরে অধর দে-কে ধরে ফেলেছে আর তা নিয়েই যত হইহট্টগোল।' শাশুড়ি বললেন: 'হ্যাঁ, তা আমি ভালোমতোই জানি। লোকটা এসেছিল টাকা ধার করতে। এতে খারাপ গন্ধ শোঁকার কী আছে? লোকটাকে ধরেবেঁধে পেটানোর এটা কী কোনো একটা কারণ হল?' কেউই তাঁকে বোঝাতে পারছিল না যে ব্যাপারটা মোটেই টাকা ধার করার নয়। শেষে খুড়শ্বশুর আমার ভাশুরকে সব কথা জানালেন। তিনি রাগে গনগন করতে করতে বাড়িতে এসে গর্জন করে উঠলেন: 'দুটোকেই খুন করে ফ্যাল।' মৃণাল ভয়ে মরা কান্না জুড়ে দিল। শাশুড়িও দ্বিগুণ তেজে জবাব দিলেন: 'প্রাণ থাকতে এ-কাজ আমি কাউকে করতে দেব না।' তাঁর বড়ো ছেলে বললেন: 'বেশ কথা। তাহলে মৃণালের মায়ের চুল কামিয়ে ন্যাড়া করে দাও আর নাক কেটে নাও। ওই লোকটাকে চুরির দায়ে পুলিশে ধরিয়ে দাও।' শাশুড়ি তাও করতে দেবেন না। তিনি বড়ো ছেলের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন: 'তুই কি মনে করিস, এরকম কাজ করলে তোর পৌরুষ আরও খোলতাই হয়ে উঠবে? ওকে যদি তুই মরিয়া হওয়ার দিকে ঠেলে দিস, ও কি আর তোকে মানবে; মুখে যা আসে তাই বলবে। আমার গলায় কলঙ্কের একটা কাঁটার মালা তো ঝুলেই আছে। ও যদি হৈমবতীর নামে গুজব রটায় তখন? আমার মুখে কি কালি পড়বে না?' আমরা এসব শুনছি আর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। এসব দেখেশুনে এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি যে কাপড়ে-চোপড়ে পেচ্ছাপই করে ফেলেছিলাম। শেষমেশ শাশুড়ির কথাই রইল। তিনি ওরকম চরম ভয়ংকর কোনো কিছু ঘটতে দিলেন না। শুধু মৃণালের মায়ের মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে দেওয়া হল।

এসব দেখেশুনে ভয়ে আমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। ভাবছিলাম এরপর আশু মিত্র কাকে ধরবে? ও যদি আমার নামে আজেবাজে রটায়? যাকগে, শাশুড়ি তো আছেন। উনি যত দিন আছেন, উনিই আমাদের দেখবেন—ততদিন আমাদের ভয়ের কিছু নেই।

এবাড়িতে আমার আর এতটুকুও মন টিকছিল না, একটুও ভালো লাগছিল না এখানে থাকতে। ওদের চালচলন, আচারব্যাভার জঘন্য রকমের নোংরামিতে ভরা। সারাদিন ধরে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি চিৎকার-চেঁচামেচি লেগেই আছে। খুড়িশাশুড়ি আর মৃণালের মা কাজিয়া বাঁধানোর কায়দাকানুন বেশ ভালোমতোই রপ্ত করেছেন। আর কী করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হয়, তাও ওঁদের থেকে ভালো বোধ করি কেউ জানে না। বড়ো ছেলের দিনরাত কাটে বারমহলেই। রাতে সেখানে বসে মদের আসর। মহিমা নামে এক বোষ্টুমী তাঁর সাথে রাত কাটায়। এরকম বেলেল্লাপোনা ওদের পরিবারের গা-সওয়া, ওরা এগুলোকে খারাপ কিছু মনে করে না। বাড়ির সব ক-টি কর্তারই একই ছিরি। কেবল মেজো ভাশুরের এসব বদ অভ্যাস কিছু নেই। তাঁর স্ত্রীও ভদ্র ও মর্যাদাময়ী।

বাপের বাড়ি থেকে কয়েকদিন বাদে খবর এল মায়ের একটি মেয়ে হয়েছে আর বাবার শরীর আগের থেকে কিছুটা হলেও ভালো। খবরটা শুনে আমার প্রাণ খানিকটা জুড়োল।

ন-মাস বাদে আমি একদিন স্বপ্ন দেখলাম: বাবা মৃত্যু শয্যায় আর আমাকে বলছেন, 'বাছা, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার সংস্থানের ব্যবস্থাপত্র করে গেলাম।' ঘুম ভেঙে গেলে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম; বুক চাপড়াতে লাগলাম পাগলের মতো। শাশুড়ি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন: 'দূর পাগলি! স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয় নাকি? তোর নিজের কিছু হচ্ছে বলে যে স্বপ্নটা দেখছিস সেটা আসলে অন্য কারোর।' সত্যি কথাটা হল, বাবার মৃত্যু সংবাদ তাঁরা আগেই পেয়েছেন আর তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতেন। এসবের বিন্দুবিসর্গও টের পাইনি; আমাকে ওঁরা বাপের বাড়িতেও পাঠাননি। চিঠি আসত কিন্তু সে চিঠি আমি পেতাম না। আমার খরচের মাসোহারা আসত, সে আমি নিতে পেতাম না কিন্তু শাশুড়ি অবশ্যই নিতেন। তিনি আমার জন্যে নারকেল কুলের নকশা দিয়ে কয়েকটা চূড় বানাতে দিলেন। আমি ভেতরে ভেতরে খুব ভয়ে উদ্‌বেগে কাটাতাম। কিন্তু কী করব আমি? আমি তো একেবারে সহায়-সম্বলহীন। শাশুড়ি ওই খুদে দুটো বাচ্চাকে সামাল দিতে পারতেন না। তার ওপর তাঁর ননদ তখন মৃত্যুশয্যায়। শাশুড়িকেই ওঁর দেখভাল করতে হত। ছেলেদের কাছে গিয়ে কিছুদিন যে থাকবেন ভেবেছিলেন, তারও কোনো উপায় রইল না। পিসিশাশুড়ি মাসখানেকের মধ্যেই মারা গেলেন। এই সময়টাতেই আমার বিপত্নীক বড়ো ভাশুর তাঁর শালিকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার

Advt.

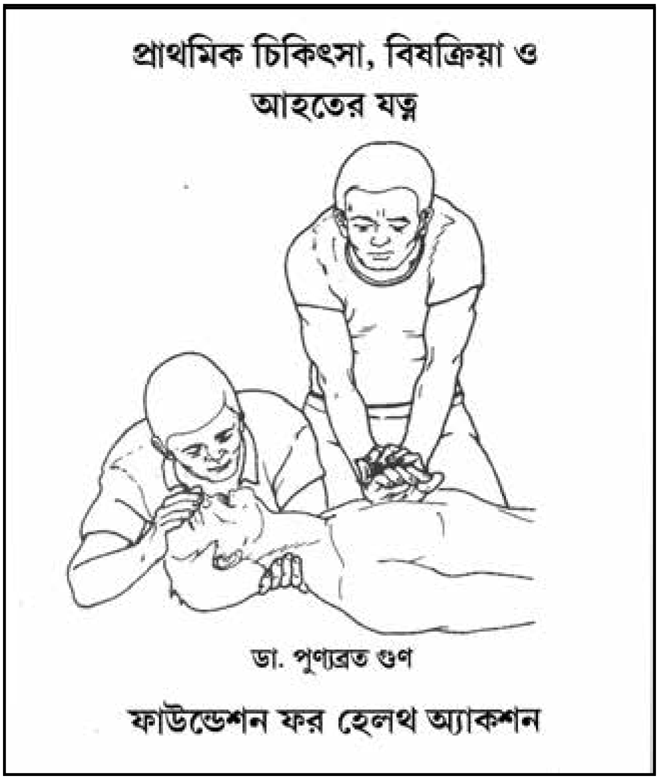

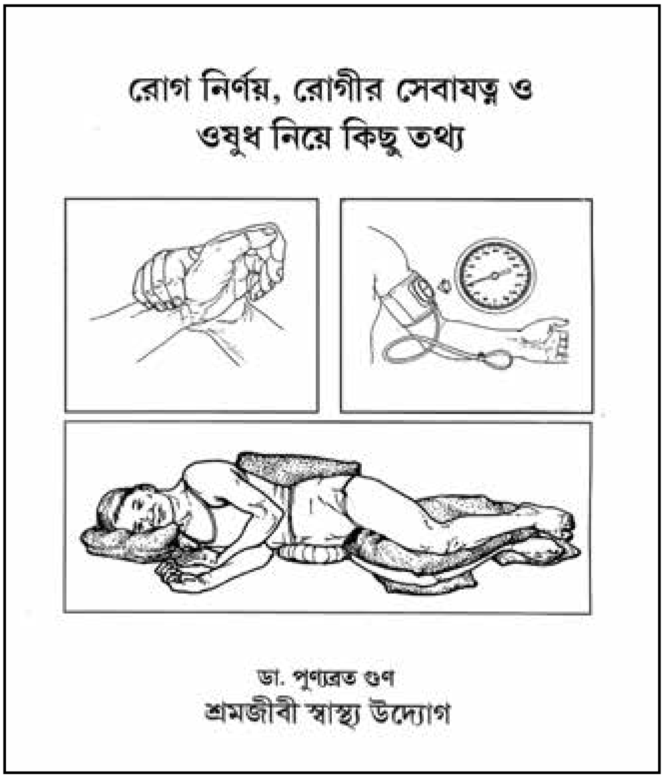

সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত ও ক্ষুধাহীন পৃথিবী কি সম্ভব?

কোনো অলীক কল্পনা নয়। দিবাস্বপ্নও নয়। ভারত সহ ১৯৩ টি রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। লক্ষ্য পৃথিবীকে সম্পূর্ণ দারিদ্রমুক্ত করা। এমন একটা বিশ্বগড়ে তোলা যেখানে একটি মানুষও অনাহারে থাকবেন না। ২০১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন Sustainable Development Goals (SDG) এর অন্তর্গত যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছেন এগুলি তারই অংশ। সময়সীমা পনেরো বছর। অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা একটি সুস্থায়ী (sustainable) ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব আশা করতে পারি। এই বিশ্বে মানবাধিকার থাকবে অটুট। থাকবে না কোনো অন্যায্য বৈষম্য। কিন্তু তা কি সম্ভব? লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি**।

এক শক্তিশালী স্বপ্ন

১৯৯২সালে ব্রাজিলের রিও শহরে রাষ্ট্রপুঞ্জ আয়োজিত "আর্থ সামিট"এ বিশ্বজুড়ে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও টেকসই (sustainable) উন্নতি সাধনেরএকটি রূপরেখা রচিত হয়। এরপর ২০০০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিউইয়র্কে "মিলেনিয়াম সামিট"এ আটটি "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" বা MDG স্থির করে, যার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীব্যাপী স্থায়ী উন্নতি সাধনের একটি সুঠাম রেখচিত্র গঠন। অংশগ্রহণকারী দেশগুলি সেই মর্মে ২০১৫ সালের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষ্যপূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সহস্রাব্দ-স্বপ্নাবলি কতখানি সফল সে প্রশ্নে পরে আসছি। MDG -র গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু অভিযোগ থাকলেও SDG রচনার সময় রাষ্ট্রপুঞ্জ যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং প্রায় তিন বছর ধরে জনসমীক্ষা চালিয়ে সতেরোটি মূল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এই সতেরোটি মূল লক্ষ্যের অধীনে আছে ১৬৯-টি বিভিন্ন টার্গেট, যাদের সাফল্য ব্যতিরেকে সুদিন আসা অসম্ভব। একমাত্র সময়ই বলতে পারবে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই স্বপ্নাবলি কতখানি সার্থক হবে। তবে এদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই। MDG-র মার্কশিট হাতে নিলে সাফল্য ও ব্যর্থতার দড়ি টানাটানিতে বিচার অমীমাংসিত থেকে যেতে পারে। তবে SDG-র ব্লুপ্রিন্ট যে আরও অনেক পোক্ত সে বিষয়ে খুব একটা সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বপ্ন কি সফল হবে?

সংখ্যাতত্ত্বের দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পর্যালোচনা করলে হয়তো অনেকক্ষেত্রেই হতাশ হতে হবে। তবে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র, অপুষ্টি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু, নিরাপদ পানীয় জল, সর্বশিক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে MDG বেশ কিছুটা সফল। এই পনেরো বছরে অতি-দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা হয়তো পঞ্চাশ শতাংশ কমেছে। কিন্তু আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান, মালাওয়ি অথবা ঘরের কাছে হিমালয়ের কোলে চা বাগানের ওই ক্ষুধার্ত মানুষগুলির জীবনে কতখানি উন্নতি হয়েছে সে কথা আগে ভাবা দরকার। লিঙ্গ বৈষম্য, মানবাধিকার, সম্পদের অসম বণ্টন ইত্যাদি প্রশ্নে অগ্রগতি না হলে সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্ন যে অধরাই থেকে যায়। সমাজের তথাকথিত উপরতলার মানুষ যখন ঠান্ডা ঘরে বসে অনগ্রসর মানুষজনের কথা ভাবেন সেই “টপ-ডাউন” মডেলে ফাঁক তো থাকবেই। তাছাড়া এই সমস্ত লক্ষ্যপূরণ যোগদানকারী দেশগুলির কাছে ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয়। অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির জন্য রাষ্ট্রনেতাদের জনগণের কাছে জবাবদিহিও করতে হয় না। বাধ্যবাধকতার অভাব অবশ্য SDG-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতএব রাষ্ট্রপুঞ্জ যাই ভাবুক না কেন প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির আন্তরিক অংশগ্রহণের ওপর।

সার্বিক দারিদ্র দূরীকরণ কি সম্ভব?

দারিদ্রের নানা রূপ, নানা রং। বহুবিধ তার বহিঃপ্রকাশ। দারিদ্রের কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা হয় না। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই রাষ্ট্রপুঞ্জ দারিদ্র দূরীকরণে সচেষ্ট। SDG-রও সর্বপ্রথম লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি স্তরে সম্পূর্ণ দারিদ্রমোচন। এ যেন এক দুর্ভেদ্য মিথ্। বাস্তবে কি এই মিথ্ কখনোই ভাঙা সম্ভব? ২০০৫ সালের নিরিখে অতিদারিদ্রের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা ছিল দিনে আয় ১.২৫ ডলার বা তার কম। মূল্যস্ফীতির কারণে ২০১১-য় এই মান পুণর্নির্ধারিত হয় ১.৯০ ডলারে। কিন্তু দারিদ্র মানে তো শুধু অর্থাভাব নয়। এর অভিব্যক্তি খাদ্যাভাবে, ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে অন্ততপক্ষে ৭০০ মিলিয়ন মানুষ ‘অতিদারিদ্র’ সীমার নীচে আছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি ন্যূনতম পরিষেবা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। দারিদ্রের বহিঃপ্রকাশ যেমন বহুমাত্রিক, কারণও বিবিধ। রাষ্ট্রপুঞ্জ কি পারবে প্রয়োজনমাফিক কর্মসংস্থান করতে? সামাজিক বর্জন (social exclusion) রুখতে? বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাক্স-এর মতে, চূড়ান্ত দারিদ্র নির্মূলীকরণের আনুমানিক খরচ বছরে ১৭৫ বিলিয়ন ডলার। অঙ্কটি অনেক বড়ো শোনালেও এটি পৃথিবীর ধনীতম দেশগুলির সম্মিলিত আয়ের এক শতাংশেরও কম।

ক্ষুধার কাহিনি কি অন্তহীন?

দারিদ্র দূরীকরণের মতো সার্বিক উন্নয়নের দ্বিতীয় মূল ধাপ হল প্রচণ্ড (extreme) খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি দূরীকরণ। এ যেন এক মরীচিকা। ক্ষুধার্ত মানুষ কর্মক্ষমতা হারায়। উপার্জনহীন হয়ে পড়ে। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যায়। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ৮০০ মিলিয়ন লোকের বাস, যাঁরা চূড়ান্ত ক্ষুধার শিকার এবং যাদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। বছরে ২৬৭ বিলিয়ন ডলার জোগান দিতে পারলে নাকি এই পরিস্থিতি আমুল পালটে যেতে পারে। কিন্তু অর্থনীতিবিদের কষা অঙ্ক আর বাস্তব জীবন তো এক নয়। অতএব চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সার্বিক প্রচেষ্টা।

আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

পনেরো বছরের মধ্যে প্রায় এক বছর ছয় মাস অতিক্রান্ত। সাধারণ মানুষের কাছে SDG এখনও এক অশ্রুত শব্দবন্ধের বেশি আর কিছু নয়। বিশ্বজুড়ে গৃহীত কোনো কর্মসূচিই সফল হতে পারে না যদি ভারতের মতো বিশাল দেশ তাতে অংশগ্রহণ না করে। রাষ্ট্রপুঞ্জের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অব্যবহিত পরেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের দায়বদ্ধতা স্বীকারও করেছেন। তদানীন্তন যোজনা কমিশনের স্থলাভিষিক্ত “নীতি আয়োগ”-এর হাতে দায়িত্ব বর্তেছে SDG-র লক্ষ্য পূরণে রোডম্যাপ তৈরি এবং নজরদারির। তবে এখনও পর্যন্ত এরকম এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারের সামান্য অংশও শোনা যায়নি। রাজ্যগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া যে এগোনো সম্ভব নয় সেকথা অবশ্য কিছু কিছু মহল থেকে শোনা গেছে। আসলে আমাদের দেশের সমস্যা আরও গভীরে। ইতিহাস বলছে, গৃহীত আন্তর্জাতিক কর্মসূচির ফলাফল পরিমাপে আমরা নিজেদের মতো করে মানদণ্ড স্থির করেছি। নিরাপদ পানীয় জল বলতে আমরা বুঝেছি হ্যান্ড পাম্প বা টিউবওয়েলের জল। সাক্ষরতার মানে করেছি কোনোরকমে সই করতে পারা। তার সাথে রয়েছে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য প্রকাশের সমস্যা। সমীক্ষায় প্রকাশ SDG-র রূপায়ণে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ১৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। গত কয়েক বছরে জনহিতকর কর্মসূচিতে সরকারি বরাদ্দ হ্রাসের যে প্রবণতা আমরা দেখেছি তার পরেও কি খুব একটা আশা রাখা যায়? রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রকাশিত MDG ২০১৪ রিপোর্ট অনুযায়ী সন্তোষজনক আর্থিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে অন্ততপক্ষে ১.২ বিলিয়ন মানুষ চূড়ান্ত দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। আমরা জিডিপি-র মতো গড়পড়তা হিসেব করে নিজেদের সম্পদশালী দেশ হিসাবে জাহির করতে উদ্যত হই। অথচ জনসাধারণের জন্য এমন কোনো প্রকল্প নিই না যেখানে দেশের প্রতিটি প্রান্তিক ও অনগ্রসর মানুষ তার সুফল ভোগ করেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং কিছু সরকারি উদ্যোগের প্রেক্ষিতে আগামী কয়েক বছরে ভারতবর্ষে গোজাতির চোখ ধাঁধানো উন্নতি অনুমান করা যায় কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিকল্পনা মাফিক মনুষ্যকূলের কতখানি উন্নতি হবে সে ব্যাপারে হলফ করে কিছু বলা যাচ্ছে না। নিরীহ, অবলা চতুষ্পদীদের প্রতি বিন্দুমাত্র ঈর্ষা না করেও বোধহয় এই মন্তব্য করা যায়। যে তীব্রতার সাথে রামনবমী পালিত হয় অথবা হনুমান জয়ন্তী উদযাপিত হয় তার সামান্য ছিটেফোঁটাও যদি সামাজিক উন্নয়নের উদ্যোগে দেখা যায় তাহলেও খানিকটা আশার সঞ্চার হয়।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, এমবিবিএস, এফআরসিওজি, স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে

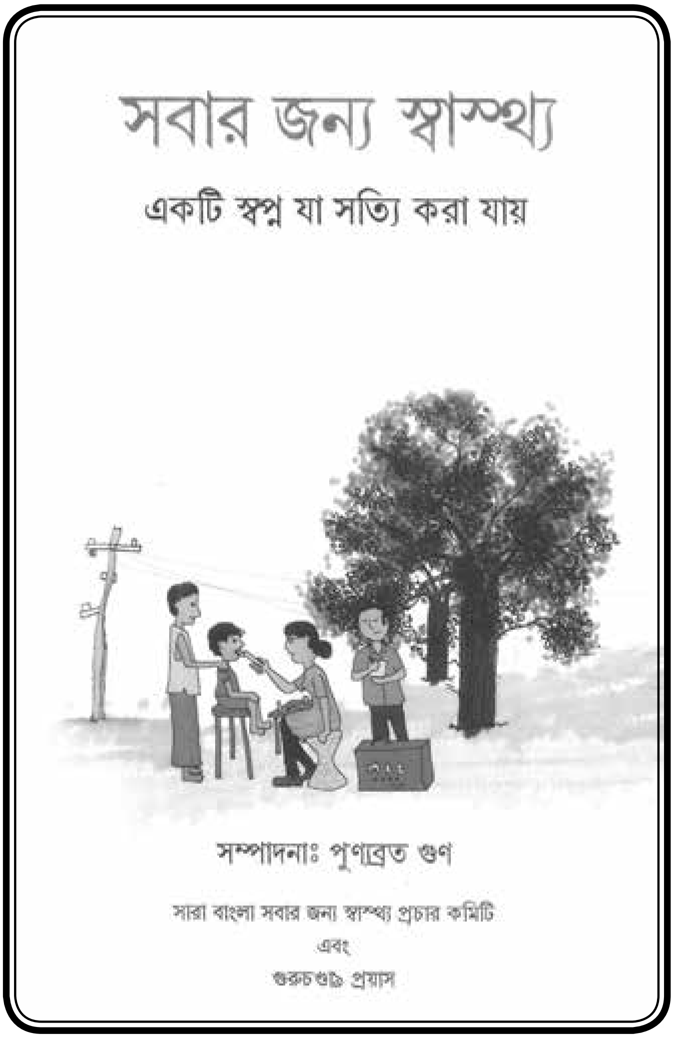

ডা. কে. শ্রীনাথ রেড্ডি

ডা. বিনায়ক সেন

ডা. অরুণ সিং

ডা. রাহুল মুখার্জি

সত্য শিবরমণ

বঙ্কিম দত্ত

ও

অলকেশ মণ্ডল-এর

বক্তৃতার সংকলন

প্রাপ্তিস্থান

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

চেঙ্গাইল বেলতলা, চেঙ্গাইল

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

যোগাযোগ - ৯৮৩০৯২২১৯৪

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস কী?

ডা. রাহুল মুখার্জী

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস হল ব্রিটেনে সরকারি খরচে চালু সে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার নাম। উপযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট মানের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ ধনী এবং দরিদ্র সকলেরই সমানভাবে পাওয়ার অধিকার রয়েছে, এই মূল ধারণাগত অবস্থান থেকেই ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস যুক্তরাজ্যের সকল নাগরিকের সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage)-র দায়িত্ব নেয়, যেখানে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনোরকম টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যাপার থাকে না।

সরকারি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের পাশাপাশি ব্রিটেনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাও চলে, যার প্রায় পুরোটাই চলে ইন্সিয়োরেন্সের মাধ্যমে। তবে জনসংখ্যার মাত্র ৮% এই বেসরকারি ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। এই বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাটি মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের বর্ধিতাংশ হিসেবেই কাজ করে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ইন্সিয়োরেন্সের টাকা দেয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত চিকিৎসাকে করযোগ্য সুবিধা হিসেবে ধরা হয়। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস সর্বাঙ্গীণভাবে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে চিকিৎসার অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলিতে (যেমন প্রসবকালীন এবং প্রসব-পরবর্তী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিষেবা) বেসরকারি ব্যবস্থা প্রতিযোগী হিসেবে আসতেই পারে না, এবং ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানিগুলিও এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে তাদের বীমার আওতার বাইরে রাখে। আবার অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেগুলি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের আওতার বাইরে পড়ে, কেউ চাইলে টাকা দিয়ে এইসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে এইসমস্ত সুবিধা কিনতে পারেন, যেমন কসমেটিক সার্জারির মতো কিছু কিছু ক্ষেত্র।

মূলত কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাপ্ত করের টাকা থেকে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস চললেও, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস, এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের স্থানীয় প্রশাসনই স্থানীয়ভাবে মূল চালকের ভূমিকায় থাকে। ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বাকিগুলির তুলনায় অনেকটাই বড়ো, এবং সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্যসচিব এর দায়িত্বে থাকেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের নীচের স্তরে রয়েছে দশটি strategic health authority যারা নিজেদের এলাকায় ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে।

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস দুই রকমের চিকিৎসা প্রদান করে: প্রাথমিক চিকিৎসা ও দ্বিতীয় স্তরের চিকিৎসা।

১. প্রাথমিক চিকিৎসা: এটির সঙ্গে যুক্ত আছেন জেনারেল ফিজিসিয়ান, ডেন্টিস্ট, চোখের ডাক্তার প্রমুখ। এছাড়াও এঁদের এবং রোগীদের সাহায্যের জন্যে রয়েছে এনএইচএস এর সর্বক্ষণের টেলিফোনে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার দেখভাল করে Primary Care Trust, যারা দ্বিতীয়স্তরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ রাখে। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে এই প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্যে ব্যয় হয় স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দের ৮০ শতাংশ।

২. দ্বিতীয় স্তরের চিকিৎসা: এর আওতায় পড়ে আপৎকালীন চিকিৎসা, স্পেশালিস্ট চিকিৎসা, এবং অপারেশন। এই ক্ষেত্রগুলি সামলায় NHS Trust। যার কার্যকারী ভাগগুলি হল, Acute Trust, যারা দ্বিতীয় স্তরের হাসপাতালগুলি চালায়। এই Acute Trust-এই ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করেন। রয়েছে Ambulance Trust, যারা সমস্ত ইংল্যান্ড জুড়ে রোগী পরিবহণের দায়িত্বে। আর রয়েছে Foundation Trust, যার আওতায় পড়ে সমস্ত বড়ো NHS হাসপাতাল এবং NHS এর অন্যান্য সমস্ত কাজ। এগুলি সামলান স্থানীয় কর্মী এবং অলাভজনক সরকারি কর্পোরেশন।

এর পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্য নিয়ে সামাজিক স্তরে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও ট্রাস্ট রয়েছে। এই সমস্ত কাজকর্মের নির্দেশিকা তৈরি, পরামর্শ দেওয়া, এবং কাজকর্মের গুণমান নজরে রাখে NHS এর নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সসেলেন্স (NICE)।

অতীতকথা

NHS এর শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সাল নাগাদ। এমন একটা সময় যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। সমস্ত দেশ ক্লান্ত অবসন্ন, কিন্তু যুদ্ধকালীন অপ্রাচুর্য ও অতি সামান্যের মধ্যেও যথাসাধ্য নির্মাণের চেষ্টার স্বভাবে মানুষ তখন নিয়মনিষ্ঠ। NHS গড়ে ওঠার ধারণাগত ইতিহাস কিন্তু আরও পুরোনো। উনবিংশ শতক থেকেই অনেকেই মনে করতেন সকলের জন্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সভ্য সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের মতো কিছু কিছু মিউনিসিপালিটিতে এরকম সরকারি হাসপাতাল চলত। অনেকে এই সমস্ত ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন, কিন্তু ওয়েব-দের মতো সোশ্যালিস্টরা দাবি করতেন একটি পরিপূর্ণ সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা ইন্সিয়োরেন্স ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে, যেখানে আগে থেকে কিছু কিছু করে টাকা জমিয়ে

অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে।

১৯১১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি ন্যাশনাল হেলথ ইন্সিয়োরেন্স অ্যাক্ট লাগু করে। নামে ন্যাশনাল হলেও এই ব্যবস্থাটি ছিল খুবই সীমিত। কেবলমাত্র ব্রিটেনের শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা, সাধারণ ঔষধপত্র ও কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া ছাড়া আর কিছু এই ব্যবস্থায় ছিল না। এমনকী সেই শ্রমিকের পরিবারের অন্যদেরও কিন্তু এই সুবিধার আওতায় আনা হয়নি। কিছু ভবিষ্যনিধি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ডাক্তারদের ক্লাব জাতীয় সংস্থা ছোটো আকারে কিছু কিছু হেলথ ইন্সিয়োরেন্স ব্যবস্থা চালাত। এইসব নেহাত ছোটোখাটো উদ্যোগ ছাড়া বাকি সকলের জন্যে কিন্তু পয়সা দিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে, বা দাতব্য হাসপাতালে বা কিছু কিছু সরকারি হাসপাতালেই যেতে হত। সরকারি হাসপাতালগুলি তুলনায় বড়ো হলেও ১৯৩০ সাল থেকে মন্দার বাজারে হাসপাতালগুলোর অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হতে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থা দুটি আলাদা আলাদাভাবে চলতে থাকে। সরকারি হাসপাতালে স্পেশালিস্ট ডাক্তার অনেক সময়েই পাওয়া যেত না, তাদের বেশির ভাগই বেসরকারি হাসপাতালে বেশি আর্থিক সুবিধার জন্যে সেখানে কাজ করতেন। জেনারেল প্র্যাক্টিশনার ডাক্তার ও স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের কাজের কোনো নির্দেশিকা ও বিভাজন না থাকায় এই নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীর কাজে নিয়োজিত চিকিৎসাবাহিনীগুলি থেকে সংগঠনিক কাঠামো ও পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা বোঝা গেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে লর্ড ডসন একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। স্থানীয় সরকার আইন (Local Government Act (1929)) অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 'দরিদ্র আইন' মোতাবেক চালিত হাসপাতালগুলো নিয়ে সেগুলোকে মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে পরিণত করে, তার মাধ্যমে দরিদ্রদের বদলে পয়সা দিয়ে চিকিৎসা কিনতে সক্ষম মানুষদের চিকিৎসা করতে শুরু করেছিল। হাসপাতালগুলোর অনেক উন্নতি দরকার ছিল। যা পরিষেবা দেওয়া হত তা ছিল অব্যবস্থায় পূর্ণ। চিকিৎসার গুণমান একজায়গায় এক-একরকম ছিল। লন্ডন আর মিডলসেক্স কাউন্টি কাউন্সিল দারুণ কাজ করছিল, অন্যরা তা করতে পারে নি। কোনো কোনো হাসপাতালে একই স্পেশালিটির একাধিক ডাক্তার ছিলেন, আবার অন্য হাসপাতালে সেই স্পেশালিটির কোনো ডাক্তারকেই পাওয়া যেত না। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে এই পুরো ব্যবস্থাটাকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলতে থাকে, যারই ফলশ্রুতিতে বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য রিপোর্ট পেশ হয়। এর মধ্যে BMA, Political & Economic Planning এবং Hospital Association এর রিপোর্ট ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও King's Fund ও Nuffield Provincial Hospital Trusts এর মতো যারা বিভিন্ন হাসপাতালের দায়িত্বে ছিল সেই সব সংস্থাও এই ভাবনাচিন্তার শরিক হয়।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটেনে দুটো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাব ওঠে। এ-দুটোর মূল কথা ছিল এইরকম

১. প্রথম প্রস্তাব অনুসারে, ১৯১১ সালের সীমিত ইন্সিয়োরেন্স অ্যাক্টের পরিবর্ধন করে একটি সামগ্রিক জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা তৈরি করতে হবে।

২. দ্বিতীয় প্রস্তাব চাইল স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নতুন করে সবার জন্য তৈরি করতে, যাতে স্থানীয় অর্থে চালু স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোকে সামগ্রিক চেহারা দিতে। এর পেছনে দর্শন ছিল এই যে সমাজের দায়িত্ব হল তার সদস্যদের স্বাস্থ্যের দেখভাল করা।

তারপর ১৯৩৯ সালে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই জরুরি পরিস্থিতিতে গড়ে উঠল আপৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগল নতুন ধরনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে। ১৯৪২ সালে বেভেরিজ সরকারের জনকল্যাণ বিষয়ক একটি রিপোর্টে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে বিশেষ কিছু বললেন না, কিন্তু বললেন যে সবার জন্যে স্বাস্থ্য একটি অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক সুরক্ষা। ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রকৃতি কী হবে সেটা ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতাদের মধ্যে বিভাজনের একটা বড়ো কারণ ছিল। এক দলের মত ছিল আঞ্চলিক সরকার এই ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবে। অন্য দল স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালানোর কথা ভাবছিলেন। ইতিমধ্যে ক্ষমতায় থাকা কনজারভেটিভ পার্টি ১৯৪৪ সালে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পরিচালনার পরিবর্তে স্থানীয় সংস্থাকে দিয়ে আঞ্চলিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা সাজানোর জন্য শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি আনুরিন বেভানের ওপর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

বেভান সম্পূর্ণ আলাদাভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার নকশা তৈরি করেন। তাতে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী ও স্থানীয় সংগঠন পরিচালিত সমস্ত হাসপাতালকে জাতীয়করণ করে অঞ্চলভিত্তিক পরিকাঠামোর কথা বলেন। অসীম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও বেভানের মূল সুপারিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়ে যায় এবং গড়ে ওঠে "ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস"। সময়টা হচ্ছে ৫ জুলাই, ১৯৪৮ সাল।

১৯৪৮ এর আগে ব্রিটেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবস্থা ছিল নিতান্তই করুণ। কম মজুরির শ্রমিকরা সপ্তাহে চার পেনি করে ন্যাশনাল ইন্সিয়োরেন্স খাতে জমা দিত, তার বদলে প্রয়োজনে প্যানেল ডাক্তারকে দেখাতে পেত, সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। মহিলা ও শিশুরা কিন্তু এই ন্যাশনাল ইন্সিয়োরেন্স-এর আওতায় পড়তেন না এবং প্রয়োজনে তাদের গাঁটের কড়ি ফেলেই ডাক্তারের কাছে যেতে হত। অনেকেই সেটা জোটাতে পারতেন না। নবজাত শিশুমৃত্যুর হার ছিল অনেক উপরে, প্রতি ১০০জন বাচ্চার মধ্যে ৪ জন বাচ্চার প্রসবকালীন কিংবা জন্মের প্রথম সপ্তাহে মৃত্যু হত, এছাড়াও প্রতি ১০০ জনে ৩ জন জীবনের প্রথম বছরটি পেরোনোর আগেই মারা যেত। প্রতি বছর হাজার পঞ্চাশেক বাচ্চা ডিপথেরিয়াতে আক্রান্ত হত। টিবি, পোলিও, নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস, রিউম্যাটিক জ্বরের মোকাবিলা করার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, চিকিৎসার গাইডলাইন (treatment protocol) কিছু তৈরি হয়নি। প্রত্যেক বছর হাজার হাজার মানুষ এই সব রোগে মারা পড়ত। সমস্ত রকমের চিকিৎসাই টাকা দিয়ে কিনতে হত। কিছু কিছু চ্যারিটি হাসপাতালে দরিদ্রদের বিনামূল্যে কিছু কিছু

চিকিৎসা হত। এই সব হাসপাতালে কিছু কিছু ডাক্তার বিনামূল্যে রোগী দেখতেন, আর তাঁদের রোজগার আসত বাইরে বেসরকারি হাসপাতালের রোগীদের কাছ থেকে।

স্যার উইলিয়াম বেভেরিজের ১৯৪২ সালের রিপোর্ট ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর প্রেরণা দেয়। বেভেরিজ ছিলেন বড়োমাপের অর্থনীতিবিদ ও সমাজ-সংস্কারক। তিনি বললেন, সমস্ত কর্মীরা প্রতি সপ্তাহে রাষ্ট্রকে একটা অর্থ দেবে। তা থেকে ব্রিটেনের সবার জন্য সামাজিক ইন্সিয়োরেন্স হবে—নবজাতক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকলের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হবে, ও সমাজের সমস্যা যেমন বেকারি, অবসরগ্রহণ ইত্যাদি অবস্থায় সাহায্য হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৫ সালে লেবার দল ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলী আনুরিন বেভানকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেন। বেভান ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস সংক্রান্ত আইনটি পাশ করান। দু-বছর পরে ১৯৪৮ সালের ৫ জুলাই বেভানের উপস্থিতিতে ট্রাফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার পার্ক হসপিটালে যাত্রা শুরু হল 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের'। প্রথম রোগী ১৩ বছরের সিলভিয়া বেকিংহ্যাম। পরদিন খবরের কাগজে সিলভিয়ার সাথে বেভানের করমর্দনের ছবি ছাপা হল। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস; ব্রিটেনের গর্ব, সমস্ত পৃথিবীর তাবৎ দেশের ঈর্ষা-উদ্রেককারী ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস।

বিরাট এই ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল মাত্র তিনটি:

১. এটি সেবা দেবে ব্রিটেনের আপামর জনসাধারণকে।

২. এই ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য পরিষেবা আদানপ্রদানের কোনো ক্ষেত্রে টাকাপয়সার কোনো লেনদেন হবে না।

৩. কার কী চিকিৎসা হবে, সেটা ঠিক হবে চিকিৎসাবিদ্যার যুক্তিতে, কার কত ব্যয় করার ক্ষমতা আছে তার উপর নির্ভর করে নয়।

সহজসরল, সোজাসাপটা তিনটে নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হল ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস। ১৪টি আঞ্চলিক হাসপাতাল পরিচালন কেন্দ্র তৈরি করা হল। প্রতিটি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হল তিনটি করে বিভাগ:

১. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত হাসপাতাল নিয়ে একটি বিভাগ তৈরি হল।

২. সমস্ত আঞ্চলিক ডাক্তার, ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, ডেন্টিস্ট, অপটিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট সকলকে একটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনা হল।

৩. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত জনস্বাস্থ্য সংস্থা ও উদ্যোগগুলিকে এনএইচএস এর সাথে জুড়ে নেওয়া হল।

১৯৭৪ সালে এই রিজিওনাল হেলথ বোর্ডগুলিকে রিজিওনাল হেলথ অথরিটি-তে পরিবর্তন করা হল। এই বছরই দেশের সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের অন্তর্গত করে নেওয়া হল। ২০০০ সালে সময়োপযোগী আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে এনএইচএএস-এর তিন মূলনীতিগুলির সাথে আরও কিছু নীতি যুক্ত করা হয়।

প্রায় সত্তর বছরের এই পথ চলায় এনএইচএস তিলে তিলে বেড়েছে। পেনিসিলিন থেকে শুরু করে বিটা ব্লকার, চিকিৎসাবিদ্যার ক্রমবর্ধমান ও উন্নততর জ্ঞানের প্রয়োগ সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে। কোমরের ও হাঁটুর সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন, চোখের ছানি অপারেশন, ক্যান্সারের চিকিৎসা, ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, জিন থেরাপি এরকম বিভিন্ন আধুনিকতম চিকিৎসার সুযোগ এনএইচএস-এ রয়েছে। তার সঙ্গে চিরাচরিত থেকে নবীনতম, কঠিন থেকে কঠিনতর রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণাও এনএইচএস করে চলেছে। এনএইচএস মনে রেখেছে বিভানের সেই উক্তি: "এই পরিষেবা সবসময় নিজেকে পরিবর্তন করবে, বড়ো হবে, উন্নতি করবে; এটা যেন সবসময়েই ‘অসম্পূর্ণ’ থাকে।"

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও সমাজ মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী এডুইনা হার্ট তৈরি করেন বিভান কমিশন। উদ্দেশ্য ছিল এনএইচএস-এর যাত্রায় বিভান প্রদর্শিত রাস্তা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে কিনা দেখা, এবং একই সঙ্গে বর্তমান সময়ে এনএইচএস-এর প্রাসঙ্গিকতাগুলি ফিরে দেখা। বিভান কমিশন সেই থেকে এক স্বাধীন মূল্যবান উপদেষ্টামণ্ডলী। বিভান কমিশন প্রাথমিকভাবে বিভানের মূলনীতিগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করার পর সুপারিশ করে যে বিভানের প্রাথমিক তিনটি মূলনীতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই নীতিগুলির বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নতুন করে দিকনির্দেশের প্রয়োজন রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন এগারোটি দিকনির্দেশী নীতি সুপারিশ করে :

১. সকলের জন্যে স্বাস্থ্য, প্রয়োজনমাফিক।

২. সীমিত পরিকাঠামো ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সবচেয়ে ভালো যা করা যায় তাই করার চেষ্টা করা।

৩. চিকিৎসার কোনো ক্ষেত্রে টাকাপয়সার লেনদেন না করা।

৪. এই ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ ও জনগণ উভয়ের।

৫. এই ব্যবস্থা মানুষকে গুরুত্ব দেবে।

৬. সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার।

৭. সমস্ত নীতি ও কাজে সুস্বাস্থ্যলাভ যেন অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে।

৮. সকলে যাতে সহজে এই ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারে।

৯. চিকিৎসার গুণমানের সাথে কোনো আপোশ না রাখা, আর রোগীর নিরাপত্তাকে প্রধান বিবেচ্য করা।

১০. জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকা।

১১. চিকিৎসার সমস্ত দিকগুলিতে ক্রমাগত নিজেকে উন্নত থেকে উন্নততর করে তোলার জন্যে চেষ্টা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

(পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়)

ডা. রাহুল মুখার্জি, এমবিবিএস, এমআরসিপি,এফসিসিপি, ডিটিএম অ্যান্ড এইচ, শ্বাসরোগ চিকিৎসক, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প (NHS)-এ কর্মরত। Rational Medicine Network-এর অন্যতম সংগঠক।

ডা. রাহুল মুখার্জির ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর লেখা থেকে অনুবাদ করেছেন ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি হাসপাতালে কর্মরত।

বই পড়া

একটু জল পাই কোথায়, বলতে পারেন?

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

জল পুস্তিকা ১ বাঁচতে চাই তো জল বাঁচাই, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র,
প্রকাশক সত্য নারায়ণ পাল, মহাকালী তলা, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি,
পৃষ্ঠা ৩০, মূল্য বারো টাকা।

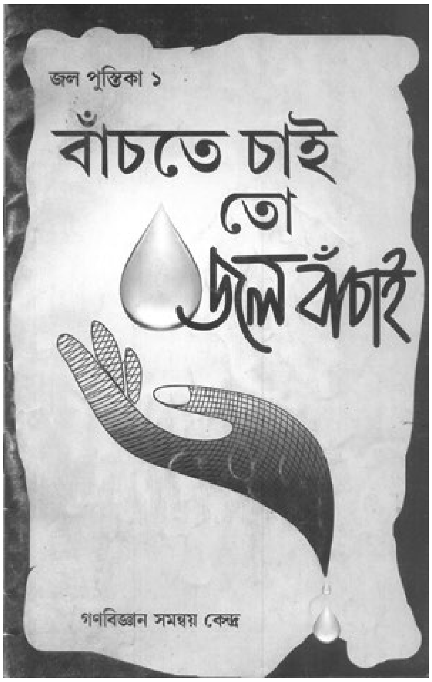

‘অবাক জলপান’-এর লোকটির মতো গোটা দুনিয়া জুড়ে এখন পিপাসার জলের জন্যে হাহাকার। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও মাইলের পর মাইল হন্যে হয়ে হেঁটে গেলেও মেলে না এক ফোঁটা জল। কথায় আছে, জলই জীবন। জলই যদি না পাওয়া গেল তবে জীবনটাই-বা থাকে কী করে? সেজন্যে জল নিয়ে আলোচনার শুরুয়াত করার জন্যে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রকে অভিনন্দন।

তবে দুনিয়াজোড়া জলসংকটের যে ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা তা যে এই চটি বইতে আঁটানো যায় না তা যে কেউ আশা করি বুঝবেন। সে কারণেই কেন্দ্র-র কাছে অনুরোধ—তাঁরা যেন জলসংকটের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনায় পড়ুয়াদের মগজে সংকটের গভীরতা কতটা, তা গেঁথে দিতে পারেন।

‘জল: যোগ-বিয়োগ’ রচনাটিতে জলসংকটের সার্বিক চিত্রের একটা স্কেচ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, আলোচনাটি সূত্রাকারে হলে পড়ুয়ারা বিষয়টি অনুধাবনে একটু বাড়তি সুবিধা পেতেন। যেমন: ১. সাগর-মহাসাগরের জল—প্ল্যাস্টিক বর্জ্য, তেলের পাইপ বা তেলবাহী জাহাজ থেকে সাগরের জলে তেল মিশে যাওয়া, ভূ-উষ্ণায়ন ইত্যাদির প্রভাব। ২. নদী-নালা, খাল-বিল, বড়ো-ছোটো জলাশয়গুলির ওপর দূষণ প্রভাব। নদীর স্বাভাবিক খাত পালটানোর জন্যে নদীবাঁধ দেওয়ার ‘কালিদাসি’ কেরামতি। ৩. পেয় জল সরবরাহে সরকারি ও পৌর সংস্থাগুলির টালবাহানা, নাগরিকদেরই পয়সায় দেদার টাকা খরচা করে কাজ হয় অষ্টরম্ভা; বোঝাই যায়, টাকাটা কাজে যৎসামান্য খরচা করে বাকি সবটাই ঢুকে যায় কর্তাব্যক্তিদের পকেটে। ৪. পুঁজিবাদীরা যেভাবে জলকে পণ্য করে ফেলছে, পেয় জল এখন বোতলবন্দি। সে জল কতটা পেয়, কতটা নয় তা দেখবে কে? তবে তেষ্টা মেটাতে গেলে নগদ টাকা গুনে দিয়ে জল কেনা। এছাড়া আছে ‘জলশুদ্ধি’-র হরেক কিসিমের কল। পৃথিবীর মাটিকে তো বহুদিন আগে থেকেই সামন্ত ও পুঁজিপতিরা দখল করে নিয়েছে। এবার জলকেও তারা দখলে আনছে। হাওয়া-বাতাসের দিকে এখনও শকুনের নজর পুরোটা পড়েনি; সেইটে সেরে ফেলতে পারলে পোয়া বারো—পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাস, কিছুই আর অন্যান্য জীবকূলসহ মানুষের রইল না, সবই গ্রাস করে নেবে পুঁজিপতিরা।

এখন হাতের নাগালে ‘খুড়োর কল’ (ইন্টারনেট) থাকায় সুবিধে অনেক। বিষয় ধরে ধরে তথ্য বাছাই করে, পড়ুয়াদের মগজে সেঁধিয়ে যায় এমন ভাষায় রচনাগুলি তৈরি হলে সাধারণ মানুষজনের কাছে জলসংকটের সার্বিক চিত্রটি তুলে ধরা যাবে।

পুরুলিয়া ও মাখলার প্রতিবেদন দুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পৌর সংস্থাগুলি বা সরকারি জনস্বাস্থ্য বিভাগগুলি নাগরিকদের পেয় জল সরবরাহের ব্যাপারে কী চরম উদাসীন।

বর্ষার জল ধরে রেখে গাঁ-গ্রামের টেকসই উন্নয়নের (sustainable development) যে বিকল্প পথ দেখাচ্ছে বসু বিজ্ঞান মন্দির সেটিকে জন-আন্দোলনে রূপান্তরিত করে পেয় জলসংকটের সুরাহার জন্যে এই বিকল্পকে সাধারণ মানুষের উদ্যোগে প্রয়োগে নিয়ে যেতে হবে। এ-কাজ করার প্রাথমিক দায়—গণ বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র-র মতো যে সংস্থাগুলি মানুষজনের মধ্যে কাজ করে চলেছে তাদের ওপর বর্তায়। বলাই বাহুল্য, সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া এ-কাজে এক পাও এগোনো সম্ভব নয়।

চটি বইটির অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়ে আছে ‘বরুণবাবুর বিপদ’ নামে একটি না-গল্প। এই আঙ্গিকটি এড়াতে পারলেই ভালো হত। লেখাটির মধ্যে বিষয়ের যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা আছে তা আঙ্গিকের কারণেই অনেকটাই খেলো হয়ে গেছে। এটি বরং সাদাসাপটা ভাষায় একটি নিবন্ধের আকারে পেশ করলে পড়ুয়ারা অনেক নিবিষ্ট মনে বিষয়টির ভেতর ঢুকে যেতে পারতেন বলে মনে হয়।

শেষে একটা কথা। যাঁরা মানুষের মধ্যে কাজ করার জন্যে লেখালেখি করেন, তাঁরা চলতি বাংলা বানান সম্পর্কে এতটা উদাসীন কী করে থাকতে পারেন, ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

যখন কোথাও কিছু নেই। চারপাশের ঘন আঁধারে নজর চলে না। তখন একটা টিমটিমে বাতির আলোতেও আমরা পথ দেখে পা ফেলার চেষ্টা করতে পারি। পুস্তিকাটি সে কাজটি সার্থকভাবে করতে পেরেছে। আশা করা যাক, তাদের ভবিষ্যৎ-প্রকাশনা আরও সুচিন্তিতভাবে হাজির হয়ে জনমানসে এক ইতিবাচক জল-সচেতনতা গড়ে তুলতে পারবে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকারের কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই।

আপনি?

‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’ প্রচার কমিটি